ঘোড়সওয়ার*

চিত্ত ঘোষাল

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৪

প্রকাশক
সুনীলকুমার ঘোষ এম. এ.

প্রচ্ছদ
নিরঞ্জন ঘোষাল

মুদ্রাকর
লেখা প্রেস
৬, ভুবন সরকার লেন,
কলিকাতা-৭

জননীকে—

ঘোড়সওয়ার

হৃদয় আদিম ৩৯

ঘোড়সওয়ার

সপ্তাশ্ববাহিত রথে সূর্য !

স্বপ্ন দেখি অশ্বযূথের······আদিগন্ত হরিৎ তৃণাকীর্ণ প্রান্তে যূথবদ্ধ আদিম অশ্বেরা······মুক্তির শক্তির সোল্লাস ঘোষণা তাদে তীব্র তীক্ষ্ণ হ্রেষায় ·····বহুদূরের পর্বতশ্রেণীতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনি হয়ে যেন তা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে······তাদের মসৃণ রোমম ত্বকে বিচ্ছুরিত সূর্যকিরণ—খরদীপ্তি মাণিক্যের মতো······উচ্ছ্রি কেশররাশিতে, লাঙুলের সুপুষ্ট কেশগুচ্ছে, পেশল জঙ্ঘায় স্ব দুর্বার গতিময়তা······ক্ষণে ক্ষণে ঊর্ধ্বমুখ তাদের ঊর্ধ্বাকাশে ছুঁ দেয়া আনন্দনিনাদ, দৃষ্টির দূরাভিসার······তাদের স্বচ্ছন্দ বিহা সুতৃপ্ত ভোজনে, দুরন্ত প্রেমলীলার ইতিহর্ষে, স্বেদশ্রান্ত বিশ্রা যেন দুর্মর জীবন · ···স্বপ্নের জীবন, সাধের জীবন····· জীবনের খ খণ্ড প্রার্থিত চিত্রকল্প··· ··

সপ্তাশ্ববাহিত রথে সূর্য তথা জীবন !

* * *

·········লোডিং······

উচ্চশক্তির অ্যামপ্লিফায়ার শব্দটি বায়ুতরঙ্গে ছুঁড়ে দিল গ্যালারি, বেঞ্চ, আরামপ্রদ চেয়ারে বসা নানাশ্রেণীর মানুষের হাতে ধরা চমকপ্রদ দামের রঙিন পানীয়ের গেলাস অথবা সিগার সিগারে চুরুট বিড়ি, কারো কারো দূরবীন, প্রায় অনিবার্য ভাবে সকলে হাতে ঘোড়দৌড়ের সাপ্তাহিক বুলেটিন এবং বনেদী ঘরানার গিলে করা পাঞ্জাবির সঙ্গে চুনোট-করা ধুতি, লপেটা ; মিনি স্কার্ট বব্ চুলের বাসি সুগন্ধের সঙ্গে হালফ্যাশনের ছত্তিরিশ ইঞ্চি ঘেরের বেল বটম ট্রাউজার জুলপি-বাবরির আপস্টার্ট বেলোয়ারী বিলাস এ হতভাগা হতচ্ছাড়া ধুতি-হাফশার্ট লুঙ্গি ইত্যাকার নানাবিধ আবরণ আভরণ ঠাটঠমক বাক্যালাপ গুঞ্জন-কোলাহলে যে বিশাল সমাবেশে

প্রত্যেকটি মানুষ ভিন্ন তাদের সবার হৃৎপিণ্ড যেন ঐ শব্দটি অ্যামপ্লি-ফায়ারে উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটিমাত্র হৃৎপিণ্ডে পরিণত হয়ে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপরই অবশ্য তাদের উৎসুক উদ্‌গ্রীব চোখগুলি প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছুটে গেল। যেন তাদের অস্তিত্বের সারাৎসার, আজন্মকালের একীভূত সব আশা-আকাঙ্ক্ষা দৃষ্টির বাহনে ধাবমান ঐদিকে!

ঐখানে তেজীয়ান অশ্বপৃষ্ঠে রঙিন পোশাকপরা জকিদের তৎপরতা, যা মূলত পেশাদারী, অথচ বহু মানুষের কল্পনায় যা এক্ষণে যেন তাদের কামনা-বাসনায় অন্তর্ব্যাপ্ত, যেন কামনা-বাসনার মতোই সত্য, বর্ণময়, প্রাণচঞ্চল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভোলে বাবা পার করেগা, জয় বাবা অমুক সাঁই, গুরুকৃপাহি কেবলম্‌······! বহুজনের আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখে ভস্মলেপন করার জন্য অশ্বকুল ও তাদের পৃষ্ঠোপরি আসীন তৎপর জকিদের অন্তরালে অনেক ধুরন্ধরের কলকাঠি অনে-কানেক আড়কাঠির হাতে নড়ে-চড়ে। খেল খতম হলে বেশির ভাগের কপালেই জোটে তাজ্জব-বনে-যাওয়া লে-হালুয়া-মার্কা বোকাটে হাসি—একে অপরের ক্ষতস্থানে মলম বুলিয়ে দিতে ঐ হাসিটিই হাসে, হাসতে বাধ্য হয়!

···রেস নাম্বার থ্রি ইন দি অফিং······

দুর্জনমুখাৎ শ্রুত যে ফলাফল পূর্বনির্ধারিত। তবু কারো অফু-রন্ত হিসাব-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে হারজিতের পরোয়া না করা কিছু উত্তেজনার অভিলাষ, কারো বৌকে ঠেঙানি দিয়ে বের করে আনা মাসখরচের শেষ ক'টি টাকা, কারো ক্লান্ত যৌনজীবনের অভ্যাসজাত সঙ্গমের মতো বহু বৎসরের বহু অর্থ জলাঞ্জলি দেয়ার অভিজ্ঞতার পরেও সাপ্তাহিক নিয়মরক্ষা। আরো কত না বিচিত্র-বিকার এক্ষণে ঐ অশ্বগুলি ও তাদের পৃষ্ঠে সওয়ার মানুষগুলিকে

ঘিরে। হ্যাঁ, বিকার, বিকৃতি! শক্তি সম্পদ আবেগের কেন এই চরম অপব্যবহার? অপচয়?

(কোটিপতি মালিকগোষ্ঠী পরিচালিত কিশোর-কিশোরীদের সচিত্র পত্রিকায় ভাবীকালের রেসুড়ে তৈরির মহান কর্তব্য পালিত হয়। প্রবন্ধ বেরোয়, শিরোনাম—রক্তে তোমার ঘোড়দৌড়ের নেশা। দৌড় শুরু হওয়ার সময়ের চমকপ্রদ বর্ণনায় লেখা হয়—'এই মুহূর্তটির জন্যই তুমি অপেক্ষা করছিলে—সত্য উদঘাটনের এই মুহূর্ত—হয়তো একগুচ্ছ নোটে ভর্তি হবে তোমার পকেট অথবা রিক্ত-হস্ত হয়ে ফিরবে তুমি।' আগাগোড়া ধারালো কলমে তুলে ধরা হয়েছে এক বিচিত্র উত্তেজনাময় আকর্ষক জগতের কথা, যে বিষ তরুণমন অমৃত জ্ঞানে আকণ্ঠ পান করে দীক্ষিত হবে রেসুড়ের মানসিকতায়। রেসের মাঠের নানা তথ্য ও রসালো বর্ণনায় সমৃদ্ধ প্রবন্ধের শেষে হলাহলের পূর্ণ পাত্রটি সুমিষ্ট পানীয়ের চেহারায় তুলে ধরা হয়, খোলাখুলি ডাক দেয়া হয়—চলে আও বাচ্চেলোগ. দুনিয়াকা মজা লে লো, দুনিয়া তুমহারি হ্যায়। রেসকা ময়দানকা মস্তিমে মিল কর্ তুম্ ভি মরদ বন্ যাও......। 'তাই, এর পরের বার যখন ঘোড়দৌড়ের মাঠে একটি অশ্বপৃষ্ঠে চাপিয়ে দেবে তোমার ভাগ্যকে, উত্তেজিত আড্রেনালিন উত্তাল হয়ে উঠবে তোমার ধমনীর রক্তপ্রবাহে, স্ফুরিতনাসা প্রতিযোগী অশ্বেরা দ্রুত ধাবমান, ফুসফুসে অতিরিক্ত অক্সিজেনের চাহিদা মেটাতে তাদের ঈষৎ ব্যাদিত মুখ, বিস্ফারিত চোখ, শক্তির সর্বশেষ সীমায় পৌঁছে তাদের প্রতিটি মাংস-পেশী যেন ফেটে যাচ্ছে, সর্বাগ্রে শেষ সীমায় পৌঁছবার প্রাণান্তক চেষ্টায় দুর্বার তাদের গতি, তখন জেনো, তুমি, তোমার রক্তের ঘোড়-দৌড়ের উদ্দাম নেশাই এই আশ্চর্য রোমহর্ষক দৃশ্যটিকে সম্ভব করেছে।' প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে—হে মাননীয়গণ, কোন্ সত্যের কথা তোমরা বলছ? সত্যের মনোপলিটাও তোমরাই নিয়েছ দেখা যাচ্ছে! নোংরামিটা বড় বেশি খোলাখুলি হয়ে যাচ্ছে না? সত্য

সম্পর্কে বচন ঝাড়বার বাবাকেলে অধিকারের ধারণাটা এবার একটু পালটে নিলে ক্ষতি কি। আমাদের অহিংস প্রতিবাদী চোখগুলি তাতে একটু আরাম পাবে, আসলে আমাদের চোখে খচখচ করে বলেই তো যত জ্বালা! নইলে এ তো জানা কথাই যে, তোমরা যেমন চালিয়ে আসছ, চালাচ্ছ, তেমনিই চালাবে, চালিয়েই যেতে থাকবে!)

হায় অশ্ব!

হায় সপ্তাশ্ববাহিত রথে সূর্য!

* * *

—ডিমটা খেলে না জয়? এগ-পোচের প্লেটটা সরিয়ে রেখে কেদারনাথকে কফির পেয়ালা তুলে নিতে দেখে রুক্মিণী বলে।

কেদারনাথ—কেদারনাথ জয়শোয়াল, রেসের মাঠে যে শুধুই জয়-শোয়াল—চড়া দামের জকি, আর রুক্মিণীর কাছে আরো সংক্ষিপ্ত কিন্তু ভালোবাসা আর আবেগে জড়ানো ছোট্ট একটি নাম—জয়, সে হাসিমুখে রুক্মিণীর দিকে তাকায়।

এগ-পোচের প্লেটটা সরিয়ে নিতে নিতে রুক্মিণী জিজ্ঞেস করে—কতটা গেন করেছ?

—বেশি না মিনি, কেজি দুয়েক। কথাটা যতই হালকাভাবে বলুক জয়শোয়াল, মুখখানা কিন্তু তার রীতিমতো গম্ভীরই মনে হয়

—দেখে তো মনে হচ্ছে ভীষণ ভাবনায় পড়েছ।

রুক্মিণীর মুখের মৃদু অথচ সংক্রামক হাসিটা জয়শোয়ালের মুখেও একটু হাসির আভাস আনে।

—ও কিছু না, ঠিক কমিয়ে ফেলব, ম্যাটার অব এ উইক অর সো। কাছে এসো তো মিনি।

মুখটা এবার পুরোপুরি রুক্মিণীর দিকে তোলে জয়শোয়াল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে রুক্মিণী।

সোনার মতো গায়ের রঙে রোদে-পোড়া তামাটে আভা, সোনালী আর কালোয় মেশানো চুল, সাধারণভাবে লালিত্য বা পেলবতা বলতে যা বোঝায় তার লেশমাত্র নেই লম্বা ধাঁচের ভাঙাচোরা মুখ-খানায়, আর গভীর কালো ঐ দু'টি চোখ—সব আবেগের ছবি যেমন স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে ওখানে, তেমনি কখনো কখনো এক আশ্চর্য মগ্নতা—যার হদিশ ছ'মাসের কোর্টশিপ আর তার পরের তিন বছরের বিবাহিত জীবনেও পায়নি রুক্মিণী।

—কি হল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাছে এসো। জয়শোয়াল আবার বলে।

পায়ে পায়ে জয়শোয়ালেব কাছে যেতে যেতেই রুক্মিণী বলে—কেন? কাছে কেন?

লাগাম-ধরা শক্ত হাতে যেন ছোঁ মেরে রুক্মিণীকে কোলের ওপর টেনে আনে জয়শোয়াল।

—আঃ জয়.....

কিন্তু নিতান্তই মৌখিক প্রতিবাদটা নিয়ে জয়শোয়ালের কঠিন দুই হাতের আবেগতীব্র আলিঙ্গন আর চুম্বনে যেন মগ্ন মথিত হতেই তাব বুকের সঙ্গে মিশে যেতে চায় রুক্মিণী। মানুষটা এমনি করেই তাকে টানে।

—এত সুন্দর দেখায় তোমাকে সকালবেলায়...। রুক্মিণীর কানের পাশে জয়শোয়ালের মৃদু গলায় ঈষৎ কাঁপন।

—না, না, জয়..! নিজেকে একটু আলগা করে নেয় রুক্মিণী।

হঠাৎ হেসে উঠে রুক্মিণীকে ছেড়ে দেয় জয়শোয়াল—ভয় পেলে মিসি!

—পাবারই কথা, দুষ্টু হাসি ছড়িয়ে পড়ে রুক্মিণীর মুখে, নেচে ওঠে চোখের তারা, সংসারের সব কাজ পড়ে আছে। তা ছাড়া...

—তা ছাড়া?

—রেসিং ইজ ইওর ফার্স্ট লাভ, আমি তার অনেক পরে। যেন

জয়শোয়ালকে একটু উসকে দিতেই আরেকটু সরে যায় রুক্মিণী।

—নো, নেভার। আই হেট রেসিং।

ব্রেকফাস্টের টেবিল পরিষ্কার করতে করতে রুক্মিণী বলে—কথাটা তুমি অনেকবারই বলেছ জয়, রেসিং তোমার ভালো লাগে না। তা-ই যদি হবে তবে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন?

—চমৎকার! সংসার চলবে কি করে? যখন গরিব কেরানী-বাপের একগাদা ছেলেপুলের সংসারে একজন ছিলাম তখন একটা জীবনে অভ্যস্ত ছিলাম। ছু'বেলার খাবার ছিল চার-ছ'টা চাপাটি আর একটা ভাজি নয়তো ডাল। একটামাত্র ঘরে গাদাগাদি করে থাকা। নিতান্ত নিরুপায় না হলে ঐ জীবনে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। আমাকে বিয়ে করে এমনিতেই তোমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে ··।

বড়লোক বাবার সংসারে থাকার সময়কার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোনো ইঙ্গিত জয়শোয়ালের কথায় থাকলেই অস্বস্তি বোধ করে রুক্মিণী।

—জয়, প্লীজ, ও কথাটা আমার ভালো লাগে না। তুমি তো আমার কাছে কিছুই লুকোওনি। সব জেনে-শুনেই আমি তোমাকে বিয়ে করেছি। · তোমাকেই চেয়েছি, আর কিছু নয়···। তা ছাড়া, তোমাকেও গরিব বলা চলে কি?

—ওয়েল, ওয়েল, আই উইথড্র। জয়শোয়াল তাড়াতাড়ি বলে ওঠে আর ভঙ্গি করে আত্মসমর্পণের।

—থাক, আর অভিনয় করতে হবে না। আচ্ছা জয়, তোমার তো অনেক জানাশোনা, তাদের কাউকে বলে একটা চাকরি-বাকরি দেখ না। রেসিং ছেড়ে দাও। সত্যি···আমারও ভালো লাগে না তোমার এই অলমোস্ট রেজিমেণ্টেড লাইফ। নিয়মমতো চলা, একটা দিনও হেরফের হবার জো নেই, সব সময় গেল-গেল ভাব, এই বুঝি সেরা জকি জয়শোয়াল হয়ে গেল মীডিওকার। প্রত্যেকটা রেসিং সিজ্‌ন্‌-এ তোমার যে টেনশন্ হয়··· ··।

—টেনশনটা সেজন্য নয় মিনি। রেসিং ব্যাপারটাই ডার্টি। মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তো আছেই, তবু এতে যদি একটা এলিমেন্ট অব ফেয়ারনেস থাকত তাহলে অন্তত ভাবতে পারতাম জুয়াড়ীকে তার পাওনা শাস্তি পেতেই হবে। যাক সেসব কথা, বলতে ভালো লাগে না, কেমন যেন ঘেন্না হয় নিজের ওপরেও। মনে হয় সময় থাকতে জীবনটাকে যদি অন্যভাবে তৈরি করবার চেষ্টা করতাম ·····। আই ওয়ান্ট টু বি ফেয়ার, দ্যাট্‌স্ হোয়াই আই সাফার। তুমি বলছিলে জানাশোনা লোকজনদের ধবে একটা চাকরি নেবার কথা। ওরা আজ আমাকে খাতিব করে আমি একজন ক্লাস ওয়ান জকি বলে, আমার মুখ থেকে একটা কথা খসাবার জন্য ওরা হন্যে হযে ঘোবে। কিন্তু যেদিন আমি আর জকি থাকব না, দে উইল নট কেয়ার এ ফিগ ফর মি।

একটু ইতস্তত করে রুক্মিণী বলে—সত্যি বল তো জয়, শুধু কি তা-ই, এর মধ্যে ভালো লাগার কোনো ব্যাপারই নেই?

এবার উত্তর দিতে সময় নেয় জয়শোয়াল, খুব নিচু পর্দায়, যেন স্বগতোক্তির মতো ধীরে ধীরে বলে—ঘোড়া আমার অদ্ভুত ভালো লাগে মিনি, বাট আই হেট হর্স-রেসিং। শক্তি সাহস সৌন্দর্য আর আনুগত্য—দে আর অ্যান অ্যাডোর‍্যাবল লট। ওদের নিয়ে এই নোংরা খেলাটা আমার ভালো লাগে না। কিন্তু আমি হেল্‌প্‌লেস, হোয়ার এল্‌স্ ক্যান আই গেট দেম। তুমি জান না মিনি, ওদের সঙ্গে যখন থাকি, আমি যেন একটা আলাদা মানুষ হয়ে যাই...... একটা ট্রান্সফরমেশন......ঠিক বোঝাতে পারব না......

—আমি কিন্তু বুঝতে পারছি, দুষ্টু হাসিতে ভরা চোখ দুটো ঝিকমিক করে ওঠে রুক্মিণীর, হর্স ইজ ইওর ফার্স্ট লাভ, ইফ নট রেসিং। আমি নই...

—তবে রে...। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে রুক্মিণীর দিকে ছুটে যায় জয়শোয়াল।

রুক্মিণী দৌড়য় শোবার ঘরের দিকে। তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠতে থেমে যায় তু'জনেই। চোখে চোখে তাকিয়ে একটু হাসি, তারপর শ্রাগ করে টেলিফোন ধরতে এগিয়ে যায় জয়শোয়াল।

—হ্যালো, জয়শোয়াল স্পিকিং।

—হ্যালো জয়, কে বল তো?

যদিও অনেকদিন পরে, তবু টেলিফোনেও ঐ মিষ্টি ভরাট গলা চিনতে ভুল হয় না জয়শোয়ালের। তা ছাড়া রুক্মিণী বাদে 'জয়' নামে তাকে ডাকবার আর একটি মানুষই আছে।

—এতুলজী, আপনি!

—কেন, তুমি জানতে না আমি আসব?

—তা জানতাম। তবে এত আর্লি এসে পড়বেন ভাবতে পারিনি। কোনো সিজ্‌ন্‌-এই তো আপনি এত তাড়াতাড়ি আসেন না।

—দিস টাইম আই হ্যাভ গট এ বিগ চার্জ—সেভেন। তাই একটু আগেই আসতে হল। শোন জয়, আজ একবার দেখা করতে পারবে আমার সঙ্গে?

—সিওর।

—গুড। বিটুইন থ্রি অ্যাণ্ড ফোর স্টেব্‌ল্‌-এ চলে আসবে। আই উইল বি ওয়েটিং ফর ইউ দেয়ার। বাই—

—বাই—

রুক্মিণী চলে গেছে রান্নাঘরে। জয়শোয়াল ফিরে এসে বসে শক্ত কাঠের সোজা পিঠওলা প্রিয় চেয়ারটায়। সবসেরা ট্রেনার এতুলজী। নামী-দামী অনেক ঘোড়াই তৈরি হয়েছে তাঁর হাতে। বড় বড় ওনাররা দামী ব্রীডের কোল্ট আর ফিলি কিনে এতুলজীর হাতে তুলে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত। তাদের গড়ে-পিটে রেসের মাঠের আচ্ছা আচ্ছা উইনার তৈরি করতে এতুলজীর জুড়ি নেই। সারা বছরই তিনি ব্যস্ত। দেশের সবক'টা বড় রেসিং সেণ্টারে ঘুরে

ঘুরেই সময় কাটে তাঁর। সঙ্গে দলবল আর অশ্ববাহিনী। মালিক-দের সঙ্গে মোটা টাকার কনট্রাক্ট-এ এতুলজীর কারবার। অন্য গলি-ঘুঁজি দিয়েও আসে অসংখ্য টাকা। আয়কর বিভাগের খাতায় তার যৎসামান্যই ওঠে, ওঠানো সম্ভবও নয়। কারণ তাতে জয়শোয়ালের ধারণা, কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে এমন সব সাপের আবির্ভাব ঘটবে যাদের ছোবলে শুধু এতুলজীই নয়, অনেক অশ্বেতর পয়সাওলা লোককেই নাস্তানাবুদ হতে হবে। অবশ্য এতুলজীকেও কোনো অর্থেই সৎ মানুষ বলা যায় না। টাকা মদ আর মেয়েমানুষে তাঁর সমান আসক্তি এই ষাট বছর বয়সেও। কিন্তু জয়শোয়ালকে যা মুগ্ধ করে তা হচ্ছে মানুষটার ঘোড়াকে চেনবার বোঝবার আর বাগে আনবার অসাধারণ ক্ষমতা। তা ছাড়া একটা ব্যক্তিগত দুর্বলতার দিকও আছে এবং সেটাই প্রধান। ভবিষ্যতহীন বখে-যাওয়া ছোকরা জয়শোয়ালের সঙ্গে এতুলজীর পরিচয় নেহাতই ঘটনাচক্রে। কেন যে এতুলজীর মতো একজন বিখ্যাত ব্যক্তি তার মতো একটা প্রায়-বেওয়ারিশ ছেলেকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন তা আজও জয়শোয়াল ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। এতুলজীর সঙ্গে সারা দেশের রেসিং সেণ্টারগুলিতে ঘুরে বেড়ানো, কাজ শেখা, তাঁর তত্ত্বাবধানে দৌড়নো, ব্যায়াম, টেনিস খেলে কবজির জোর বাড়ানো। তারপর হঠাৎই সে রাইডিং বয়। রাইডিং বয় থেকে দ্রুত কয়েকটা পদক্ষেপে জকি। প্রথমে চাবুক হাতে নেবার অধিকার পায়নি, কোনো জকিই পায় না, অনেকের লেগে যায় বছরের পর বছর। কিন্তু জয়শোয়াল দ্বিতীয় বছরেই চাবুক হাতে নিতে পেরেছিল। তারপর দশ বছরের জকি-জীবনে সে অসংখ্য উইনারকে পৌঁছে দিয়েছে ফিনিশিং লাইনে—কখনো দুই তিন চার লেন্‌থ্‌-এর পরিষ্কার ব্যবধানে, কখনো ফটো-ফিনিশের চুলচেরা বিচারে। অল্প হলেও ব্যর্থতার ইতিহাসও তুচ্ছ নয়। অবশ্য কোনো জকিই ছেদহীন সাফল্যের ইতিহাস দাবি করতে পারে না। ঘোড়দৌড়ের ব্যাপারটা যদি অবিমিশ্র সততার

সঙ্গে পরিচালিত হত তাহলেও নয়। জকি হিসেবে জয়শোয়ালের প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন এডুলজী, সাহস তিরস্কার আর অভিজ্ঞ উপদেশ দিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন এক থেকে আরেক সাফল্যের দুয়ারে। এডুলজীর কাছে তাই জয়শোয়ালের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। তাঁর অনুরোধ মাত্রই জয়শোয়ালের কাছে অবশ্য পালনীয় আদেশ।

কিচেন থেকে ফিরে আসে রুক্মিণী।

—কে টেলিফোন করেছিল?

—এডুলজী।

—ও, দ্যাট নটি ওল্ড ম্যান!

—বাট হি হ্যাজ নেভার বিন নটি উইথ ইউ।

—ছি, ছি, মুখে কিছু আটকায় না। আমাদের সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা অন্যরকম। তা, কি বলছিলেন?

—আজ বিকেলে যেতে বলেছেন, আর কিছু বলেননি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি, গেলেই জানতে পারব।

এডুলজী জয়শোয়ালের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তাকে দেখেই এগিয়ে এসে এমব্রেস করেন।

—ওয়েল, ওয়েল, মাই বয়, ইউ আর অলওয়েজ অ্যাডিং নিউ লরেলস টু ইওর অলরেডি লরেল-স্টাডেড ক্যাপ।

—থ্যাংক্স্।

—আমার মেয়েটা কেমন আছে? মিনি?

—ভালো।

—মা হচ্ছে কবে?

—নট ইয়েট।

—মেক ইট ফাস্ট, জয়শোয়ালের পিঠ চাপড়ে হেসে ওঠেন এডুলজী, অ্যাণ্ড আই ওয়ান্ট এ স্টার্ডি বয়। আই উইল মেক হিম দ্যা

ওয়ার্লড্‌স্ গ্রেটেস্ট। তোমাকে যদি আরেকটু বাচ্চা বয়সে পেতাম ·· ··

এই আক্ষেপটা প্রায়ই করেন এতুলজী। অসম্ভব ভালোবাসেন জয়শোয়ালকে। বলেন ঠিক সময়ে পেলে দুনিয়ার সেরা জকিদের সঙ্গে তাকে একই সারিতে দাঁড় করিয়ে দিতে পারতেন। এতুলজীর এই আক্ষেপ কিন্তু জয়শোয়ালের কাছে কমপ্লিমেন্টের মতোই মনে হয়।

জয়শোয়ালের কাঁধে দুই হাত রেখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকে লক্ষ্য করেন এতুলজী।

—ইউ হ্যাভ গেনড ওয়েট, জয়। এতুলজীর গলায় স্পষ্ট তিরস্কার।

লাজুক ছোট ছেলের মতো মুখ নিচু করে জয়শোয়াল—সামান্য...

—দ্যাট্‌স্ ব্যাড।

—এক সপ্তাহেই কমিয়ে ফেলব।

—হ্যাঁ, তা-ই করো। নাউ কাম।

এতুলজীর দীর্ঘ মেদবিহীন শরীরে বয়সের ছাপ কোথাও পড়েনি, শুধু ব্যাকব্রাশ-করা ঢেউ-খেলানো মসৃণ চুলে এসেছে রুপালী একটা আভা। জয়শোয়ালের কাঁধে হাত রেখে হাঁটেন এতুলজী। তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে বেশ জোরেই পা চালাতে হয় জয়শোয়ালকে।

সারি সারি ঘোড়া স্টেব্‌ল্‌-এ। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে অ্যাটেনড্যাণ্ট। এতুলজী আর জয়কে দেখে তারা শশব্যস্ত সেলাম ঠোকে। এতুলজী নড করেন, করেন না, এগিয়ে যান।

একটা ঘোড়ার সামনে এতুলজী দাঁড়ালেন। ঘোড়ার সঙ্গী অ্যাটেনড্যাণ্ট সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেলাম করল, এতুলজী লক্ষ্যও করলেন না, তাঁর চোখ ঘোড়ার দিকে।

অবাক মুগ্ধ চোখে দেখল জয়শোয়াল। অনেক ঘোড়া সে দেখেছে, কিন্তু শক্তি আর সৌন্দর্যের এমন আশ্চর্য মিলন আর কখনো

তার চোখে পড়েনি। বয়স খুব বেশি হলে তিন। কালো-ঘেঁষা বাদামী রঙের ফার থেকে স্টেব্‌ল্‌-এর স্বল্প আলোতেও যেন আয়নার মতো আলো ঠিকরে পড়ছে। ঘাড় বেঁকিয়ে তাকানো, তীব্র প্রতিবাদের মতো ঘন ঘন মাথা ঝাঁকানো আর বলিষ্ঠ পায়ের মুহুর্মুহু আঘাতে মাটি ওপড়ানো—প্রচণ্ড শক্তিমান, জেদী, খাম-খেয়ালী তরুণ এক অশ্ব।

—জীবনলাল। মৃদুকণ্ঠে বলেন এতুলজী।

—অপূর্ব, হি ইজ রীয়্যালি ওয়াণ্ডারফুল···

—অ্যাণ্ড দ্যা মোস্ট টার্বিউলেন্ট হর্স আই হ্যাভ এভার হ্যাণ্ডেলড। আমার সবচেয়ে বড় হেডেক এখন। অলরেডি ছুটো ওয়ার্নিং খেয়ে বসে আছে। আরেকটা ওয়ার্নিং, বাস্‌, রেসিং ক্যারীয়ার খতম।

জয়শোয়ালের ঠোঁটে ছোট্ট একটু হাসি।

—কি করেছিল?

—কি করেছিল! প্রথম রেসেই টেরিবল্‌ সাইড-পুশ করে ব্লু বয়কে ফেলে দিয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে ব্লু বয় আবার উঠে দাঁড়িয়েছিল। তাই শুধু ওয়ার্নিংয়ের ওপর দিয়েই গেছে। তার পরের বার হি স্টার্টেড রানিং ক্রসওয়াইজ, অন্তত তিনজন জকি আর চারটে ঘোড়া জখম হয়েছিল। সেকেণ্ড ওয়ার্নিং। এখন কেউ আর ওকে রাইড করতে চাইছে না। অথচ হি হ্যাজ এভরিথিং—পেডিগ্রী, ক্লাস, বিল্ড, স্পীড—এভরিথিং যা একটা আইডিয়্যাল রেসহর্সের থাকা দরকার, মীডিয়াম ডিসট্যান্স-এ ওর ট্রিমেনডাস পসিবিলিটি রয়েছে.......বাট দ্যাট ওয়াইল্ড টেমপারামেণ্ট......

জয়শোয়াল এতুলজীর কথা শুনছিল, কিন্তু সর্বক্ষণ তার দৃষ্টি জীবনলালের দিকে। এতুলজীর কথা শেষ হতে সে বলল—আপনি কি চান আমি ওকে স্পার্ট করাই?

—হ্যাঁ জয়, শুধু স্পার্ট করানো নয়, আমি চাই এখানে যে ক'টা রেসে ও দৌড়বে তুমিই ওকে রাইড করবে। আমি জানি এটা খুবই

রিস্কি প্রপোজিশন, তোমার গুডউইল স্টেক করতে হতে পারে। কিন্তু তুমি বুঝবে জয়, ইট্‌স্ হিজ লাস্ট চান্স, আবার ওয়ার্নিং মানে ওর রেসিং ক্যারীয়ার শেষ। আমি চাই না এমন একটা ঘোড়াকে এভাবে হারাতে। জয়, প্লীজ অ্যাকসেপ্ট দিস চ্যালেঞ্জ। তুমি ছাড়া আর কেউ এ কাজ পারবে না। আই নো ইওর মেট্‌ল্।

জয়শোয়াল শান্তভাবে বলল—আই ডু অ্যাকসেপ্ট। ইট উইল বি এ প্লেজার।

জীবনলালের চোখে চোখ রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল জয়শোয়াল।

—টেক কেয়ার জয়। হুঁশিয়ারি দিলেন এদুলজী।

দু'পা ফাঁক করে সম্ভাব্য আঘাতটা নেবার জন্য একটু বেঁকে কাঁধটা জীবনলালের মুখের কাছাকাছি রেখে দাঁড়াল জয়শোয়াল। ঘাড় ঝাঁকিয়ে কয়েকবার তাকে আঘাত করার চেষ্টা করল জীবনলাল, কিন্তু সতর্ক জয়শোয়ালের কাঁধে ক্রুদ্ধ নিশ্বাসের ঝাপট দিতে পারল শুধু। তারপর কয়েকটা নিস্তব্ধ মুহূর্ত জয়শোয়ালের [illegible] দিকে তাকিয়ে রইল। জয়শোয়াল এবার অন্তরঙ্গ নির্ভয় স্বাভাবিকতায় জীবনলালের গলায় হাত রাখল। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশিত আঘাতটাও পেল, যার জন্য কাঁধ ও পায়ের মাংসপেশীগুলিকে প্রস্তুত রেখেছিল সে। টাল সামলে নিয়ে আবার হাত রাখল। আবার আঘাত।

—হোয়াট আর ইউ ডুইং, পেছন থেকে এদুলজী বলে উঠলেন, ইউ মে গেট হার্ট।

—লেট মি ডু ইট মাই ওয়ে।

জয়শোয়ালের কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণ দৃঢ়তায় চুপ করে গেলেন এদুলজী।

বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন জয়শোয়াল জীবনলালের গলায় হাত বুলিয়ে দেবার অধিকার পেল তখন তার পা দুটো অল্প অল্প কাঁপছে; বাঁ কাঁধে কি রকম একটা অসাড় যন্ত্রণা; জীবনলালের মুখের ফেনার

ছিটে তার মুখে, জামায়; ঘামে-ভেজা শার্ট; আর অদ্ভুত একটা হাসিতে মুখটা উজ্জ্বল।

এতুলজী বিড়বিড় করে উঠলেন - নট ওনলি ছাট বাস্টার্ড, ইউ টু আর ওয়াইল্ড, জয়।

পরদিনই স্যাণ্ড-ট্র্যাকে স্পার্টিং শুরু করল জয়শোয়াল। প্রথমে স্যাড্‌ল্ এ থাকাই দুঃসাধ্য। গ্যালপ করাবে কি, জীবনলালের চেষ্টা শুধু ওকে পিঠ থেকে ফেলে দেবার। কিন্তু সেটা অসম্ভব বুঝে এলোমেলো চক্কর দিতে লাগল, কিছুতেই কোর্স-এ থাকে না, ঠিকভাবে গ্যালপ করে না।

ট্র্যাকের পাশ থেকে চিৎকার করে ওঠেন এতুলজী—টেক ইওর হুইপ জয়, গিভ হিম এ গুড বিটিং।

কখনো সামনের পা কখনো পেছনের পা তুলে তখন বেপরোয়া লাফাতে শুরু করেছে জীবনলাল, সেই অবস্থায়ই কোনোরকমে নিজের ব্যালান্স ঠিক রাখতে রাখতে উত্তর দিল জয়শোয়াল—হুইপিং করে একে কিছু করা যাবে না এতুলজী। হিজ ল্যাঙগোয়েজ ইজ ডিফারেন্ট।

—দেন লেট ছাট বাস্টার্ড গো টু হেল। আই অ্যাম গোয়িং টু শেক হিম অফ্।

—তা হয় না এতুলজী, আমি চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছি।

আরো ঘণ্টা খানেক পরে যখন সুন্দর কোর্স মেনটেন করে স্পার্ট করতে লাগল জীবনলাল তখন যে জয়শোয়ালের পোশাকই শুধু ঘামে ভিজে জবজব করছে তা-ই নয়, জীবনলালের বাদামী-কালো শরীরটারও একই দশা।

স্পার্টিং শেষ করে জয়শোয়াল জীবনলালের পিঠ থেকে নামতেই এতুলজী তাকে জড়িয়ে ধরলেন—তুমি ঠিকই বলেছ জয়, হিজ ল্যাঙগোয়েজ ইজ ডিফারেন্ট, অ্যাণ্ড ইউ নো ছাট ল্যাঙগোয়েজ।

—পারহ্যাপ্‌স্‌ আই অ্যাম ওয়ান অব দেম। হেসে বলল জয়শোয়াল।

বাড়ি ফিরে রুক্মিণীর একদফা চোটপাট শুনতে হল জয়শোয়ালকে। জীবনলালের ব্যাপারটা কাল রাতেই জয়শোয়াল ওকে বলেছিল।

—একদিন স্পার্টিং করেই এই অবস্থা! ওজন কমানোর জন্য আর ভাবতে হবে না।

—কেন, কি হল। অবাক হবার ভান করল জয়শোয়াল।

—ঠাট্টা-তামাসা সব সময় ভালো লাগে না। আয়নায় মুখের চেহারাটা একবার দেখেছ?

—না, দেখিনি। তুমি রয়েছ কেন!

—বুঝলাম না।

—একেবারে বোকা। তুমিই তো আমার আয়না। আমি যেমন চেহারা নিয়ে ফিরি তুমি তেমনি রিঅ্যাক্‌ট্‌ কর।

বিলক্ষণ চটে, কথার উত্তর না দিয়ে রুক্মিণী ওখান থেকে চলে যাবার জন্য উঠতেই জয়শোয়াল হাত ধরে ওকে থামাল।

—এক কাপ কফি খাওয়াবে?

রুক্মিণী নিঃশব্দে চলে গেল কিচেনের দিকে। কফির প্রয়োজন ছিল জয়শোয়ালের ঠিকই, তবে এটা একটা কৌশলও বটে। যে কোনো সুগৃহিণীর মতোই পুরুষমানুষ খাবার চাইলে রুক্মিণীও খুশি হয়। ব্যাপারটা বিয়ের পরে-পরেই আবিষ্কার করেছিল জয়শোয়াল, এবং তখন থেকেই প্রয়োজনমতো সে এটা কাজে লাগিয়ে আসছে।

একটু পরে কফি আর একটা প্লেটে কিছু সল্ট-ক্র্যাকার নিয়ে ফিরে এল রুক্মিণী। জয়শোয়ালের সামনে কফি বিস্কুট রেখে সোফায় ওর পাশে বসল।

—আ—। কফির পেয়ালায় একটা লম্বা চুমুক দিয়ে রুক্মিণীর কাঁধে আলতো করে হাত রাখল জয়শোয়াল।

একসময় রুক্মিণী বলল—তুমি এত্তুলজীর কাছে ওবলাইজড্। কিন্তু তার জন্য এভাবে সুযোগ নেয়া ওঁর উচিত নয়।

—কি বলছ তুমি!

—দেখ জয়, তিন বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে। কোনোদিন স্পার্টিং-এর পর তোমার এই চেহারা দেখিনি। আমার মনে হচ্ছে এত্তুলজী একটা ডেঞ্জারাস ঘোড়াকে নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করছেন, আর তুমিও এক্সপ্লয়েটেড হচ্ছ। তোমার সুনামের প্রশ্ন আছে, ফিজিক্যাল রিস্কও কম নয়।

—তুমি অকারণে বড় বেশি চিন্তা করছ মিনি। একটা কথা তুমি ঠিকই বলেছ, জীবনলাল ডেঞ্জারাস, ওয়াইল্ড। আর সেখানেই তো চ্যালেঞ্জটা। বিশ্বাস করবে মিনি, তিন ঘণ্টা আগেও জীবনলাল আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি। নাউ উই আর গ্রেট ফ্রেণ্ডস। কাল থেকে স্পার্টিং কোনো প্রব্লেমই হবে না। আরেকটা কথা, যা শুধু তোমাকেই বলা যায়, রুক্মিণীকে কাছে টেনে আনল জয়শোয়াল, হি ইজ গোয়িং টু বি এ উইনার ইন হিজ ভেরি ফার্স্ট অ্যাপীয়ার্যান্স হিয়ার, ছাট আই প্রমিস .....

জয়শোয়ালের মৃদু উচ্চারণ আত্মবিশ্বাসে গভীর, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ। এই সুরটা রুক্মিণীর চেনা। এখানে কোনো ফাঁকি নেই, নেই মিথ্যা অহংকার, আত্মঘোষণা। রুক্মিণী নিবিড় হয়ে এল জয়শোয়ালের কাছে।

জীবনলালকে স্পার্ট করাতে শুরু করবার কয়েকদিন পরে প্রথম টেলিফোন-কলটা পেল জয়শোয়াল।

—হ্যালো, জয়শোয়াল স্পিকিং। আপনি কে কথা বলছেন?

—জনৈক বন্ধু।

—বন্ধুর নিশ্চয়ই একটা নাম আছে।

—তা আছে, তবে সেটায় আপনার দরকার নেই।

—তাহলে তো আপনার সঙ্গে কথা বলারও আমার বিশেষ দরকার আছে বলে মনে হচ্ছে না।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে গিয়েও ও প্রান্তের অদ্ভুত হাসিটা শুনে থেমে গেল জয়শোয়াল। একটা বাঁধা পর্দায় যান্ত্রিক আওয়াজ, ওঠানামা নেই, কোনো হিসেবী নিষ্ঠুর মানুষের মুখে ছাড়া যা মানায় না।

—মিস্টার জয়শোয়াল, আপনি জীবনলালকে স্পার্ট করাচ্ছেন?

—এটা কোনো গোপন খবর নয়।

—কেন মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন? ও ঘোড়াকে কেউ বাগে আনতে পারবে না।

—আমার ব্যাপার আমাকেই বুঝতে দিন। আপনার কথা শেষ হয়েছে?

আবার সেই যান্ত্রিক হাসি। একটু অপেক্ষা করে জয়শোয়াল রিসিভারটা নামিয়ে রাখল এবার।

অনেক আজে-বাজে টেলিফোন-কল আসে প্রায়ই—অভিনন্দন, উপদেশ, শাসানি, গালমন্দ, টিপ্‌স্‌-এর জন্য কাকুতিমিনতি। সেসব উপেক্ষা করা কিছু নয়। কিন্তু আজকের কলটা আলাদা, অদ্ভুত। জীবনলালকে যে সে স্পার্ট করাচ্ছে তা সবাই জানে। এ খবর গোপন রাখা যায় না। তাহলে এই টেলিফোনের উদ্দেশ্য? কি বলতে চায় লোকটা? জয়শোয়াল মন থেকে ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলতে চাইল। কিন্তু ঐ অদ্ভুত হাসির শব্দটা······

সামান্য ঘটনা, অথচ কারো সঙ্গে আলোচনা করতে না পারলে যেন স্বস্তি পাচ্ছে না জয়শোয়াল। রুক্মিণীকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না। এমনিতেই বড় বেশি চিন্তা করে মেয়েটা, অকারণে

আরো খানিকটা চিন্তা ওর মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। এচুলজীকে বলা যেতে পারে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা এতই সাধারণ—প্রায় হাস্যকর—যে এচুলজীও হেসেই উড়িয়ে দেবেন। টেলিফোনের ঐ হাসিটার মধ্যে এমন কিছু আছে যা বলে বোঝানোর নয়, অনুভব করার জিনিস। জয়শোয়ালের স্নায়ু দুর্বল নয়, জকির স্নায়ু দুর্বল হলে চলে না। তা ছাড়া জীবনে অসংখ্য বার তাকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। তবু......

দু'তিনটে দিন এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা জয়শোয়ালের মনে ঘোরাফেরা করল, তারপর কাজ আর রুক্মিণীর ভালোবাসার মধ্যে কখন ওটা হারিয়ে গেল।

অসম্ভব ভালো স্পার্ট করছে জীবনলাল। জয়শোয়ালের জীবনে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। অনেক নামী ঘোড়ার পিঠেই সওয়ার হয়েছে সে। তারা সবাই ওয়েল-ট্রেণ্ড ওয়েল-বিহেভড্। তারাও সুন্দর তেজী বেগবান। কিন্তু তাদের শক্তি-শ্রী যেন জিমনাসিয়ামে তৈরি কোনো ব্যায়ামবীরের—উজ্জ্বল আলোকিত সাজানো মঞ্চে বৈদ্যুতিক প্রভায় উদ্ভাসিত যেন তাদের ভেসলিন-মাখানো শরীরের কেতাবী পেশী-প্রদর্শনী—কালো পাথর কুঁদে তৈরি অরণ্যচারী বল্লমধারী মানবের স্বেদসিক্ত মুক্ত ভীষণ প্রবল সৌন্দর্য সেখানে অনুপস্থিত, অপ্রত্যাশিত। জীবনলালের মতো বেআদব দামাল কোনো ঘোড়ার সঙ্গে বোঝাপড়া করার সুযোগ কখনো আসেনি জয়শোয়ালের। তার স্বপ্নের অশ্ব জীবনলাল—অসীম শক্তিধর, জেদী, বেপরোয়া, বেচাল। তাকে জয় করতে হলে ভালোবাসার জাদুমন্ত্রটা জানা চাই। চাবুকের শাসানিতে কোনো কাজই হবে না। এমন একটা ঘোড়াকে জয় করার স্বপ্ন জয়শোয়ালের অনেককালের। সেই স্বপ্নের সার্থকতার আনন্দে মশগুল সে এখন। এ এক আশ্চর্য ভালোবাসা। যেখানে কথার চাতুরি চলে না; ভ্রূভঙ্গি, মুখে ফুটিয়ে তোলা হাসিকান্নার দ্যোতনা

নিরর্থক, সেখানে ভালোবাসার খবরটা পৌঁছে দেবার একটিই মাত্র উপায় আছে—সে উপায় ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার খবর জয়শোয়াল পৌঁছে দিতে পেরেছে জীবনলালকে। পেরেছে বলেই এখন জয়শোয়ালের প্রতিটি নির্দেশ মেনে নিখুঁতভাবে স্পার্টিং করে জীবনলাল। জীবনলালের পিঠে সওয়ার হলেই জয়শোয়াল অনুভব করে এ ঘোড়া সবার আগে যাবার জন্যই জন্মেছে। হি ইজ এ সিওর উইনার। অবশ্য জীবনলালের আদর আর দস্যিপনার ঝক্কি-ঝামেলাও কম পোযাতে হয না জয়শোয়ালকে।

আর সাতদিন পরেই জীবনলালের প্রথম রেস এই সিজ্‌ন্‌-এর। রীগ্যাল কাপ। জয়শোয়াল বিশ্বাসে স্থির। তার এই গোপন বিশ্বাসের কথাটা জানে শুধু আর দু'জন—রুক্মিণী আর এদুলজী।

হঠাৎ একদিন টেলিফোনে আবার সেই কণ্ঠ।

—তাহলে, মিস্টার জয়শোয়াল, জীবনলাল রীগ্যাল কাপ-এ দৌড়চ্ছে।

কথাটা আধা-প্রশ্ন আধা-বিবৃতি।

একটা রূঢ় উত্তর ঠোঁট থেকে ফিবিয়ে নিযে গিয়ে জয়শোয়াল বলল—হ্যাঁ, দৌড়চ্ছে। আর কিছু?

—হ্যাঁ, অনেক কিছু।

যেন জয়শোয়ালেব প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায়ই ওদিক থেকে এই তিনটিমাত্র শব্দ ভেসে এল। জয়শোয়ালের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হতে পারত রিসিভার নামিয়ে রাখা। কিন্তু কি জানি কেন সে তা পারল না। রিসিভার কানে চেপে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ও প্রান্ত থেকে ভারি নিশ্বাসের একটানা শব্দ। যেন মুখোমুখি দুই মুষ্টিক—একে অন্যের দুর্বলতম স্থানটি খুঁজে নিয়ে আঘাত হানবার অপেক্ষায়। লোকটাকে উপেক্ষা করতে না পারার এই দুর্বলতায় নিজের ওপর বিরক্ত হল জয়শোয়াল। কিন্তু জয়শোয়ালের অবস্থা যেন স্বপ্নের ভেতরে অতল অন্ধকার গহ্বরে গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে-

থাকা কোনো মানুষের মতো, যে অনুভব করে সামান্য ইচ্ছাশক্তিই পারে তার পতন রোধ করতে, তবু ঐটুকু ইচ্ছাশক্তিও তার আয়ত্তের বাইরে। পার্থক্যটা শুধু এই যে হঠাৎ-ভাঙা ঘুম স্বপ্নের সেই পতন থেকে প্রার্থিত মুক্তির স্বস্তি নিয়ে আসে, এখানে সে সুযোগটা নেই।

—আপনি জানেন মিস্টার জয়শোয়াল, রীগ্যাল কাপ-এ ফ্যান্সি গার্লও দৌড়চ্ছে?

—না জানার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আপনার বক্তব্যটা জানতে পারি কি?

—অবশ্যই। প্রয়োজনীয় কোনো বক্তব্য না থাকলে টেলিফোনে অনর্থক সময় নষ্ট করব কেন। ······ফ্যান্সি গার্ল মাস্ট উইন দ্যা রীগ্যাল কাপ।

জয়শোয়ালের আঙুলগুলি রিসিভারের ওপর চেপে বসল, হঠাৎ ফেটে পড়তে চাওয়া মেজাজটাকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল—ফ্যান্সি গার্ল ইজ লাইকলি টু উইন। রীগ্যাল কাপ-এর অন্য সব ঘোড়ার চেয়ে ওর পেডিগ্রী, রান-বেনিফিট, ট্র্যাক-ওয়ার্ক ভালো। কিন্তু কোনো অপরিচিত লোকের সঙ্গে এসব আলোচনা আমি করতে চাই না।

সেই বাঁধা পর্দায় উত্থানপতনহীন একটু হাসি।

—মিস্টার জয়শোয়াল, আমি আপনার অপরিচিত। কিন্তু আপনি আমাকে ইগনোর করতে পারছেন কি? পারছেন না বলেই আমার কথা শুনছেন। যাক, সোজা কথাটা এই, আপনি কো-অপারেট না করলে ফ্যান্সি গার্ল জিততে পারবে না। জীবন-লাল ইজ সিওর টু উইন।

—এ ধারণা আপনার হল কেন?

—রেসিং-এর খবর আমাকে রাখতে হয়, বুঝতে হয়।······ জীবনলাল জিতবেই।

—সো হোয়াট ?

—উত্তেজিত হবেন না। জীবনলালের জেতা চলবে না। ইউ উইল বি অ্যাম্পলি রিওয়ার্ডেড।

—আমাকে কেনা যায় না।

—রেসিং-এর জগতে ও কথাটা হাস্যকর। যেখানে সমস্ত ব্যাপারটাই......

—আপনার ধারণা পালটাতে হতে পারে। নাউ এনাফ অব ইট। বাই—

—এক মিনিট। আপনি ডিফিকাল্ট হতে পারেন এ রকম একটা আশঙ্কা আমার ছিল। ফ্যান্সি গার্লের ওনার কে আপনি জানেন ?

—এন. এস. নটরাজন। এটা কি খুব একটা দুর্লভ বা দুর্মূল্য খবর ?

—ব্যাপারটা ঠিক অতটা সহজ নয় মিস্টার জয়শোয়াল। সবাই জানে বটে ফ্যান্সি গার্লের ওনার নটরাজন। কিন্তু সত্যিকার ওনার আছেন অন্তরালে।......এবং তাঁর ক্ষমতার কথা আপনি ভাবতেও পারেন না। তিনি চান রীগ্যাল কাপ পাবে ফ্যান্সি গার্ল। সো—

—আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ?

—না, না, শুধু রিকোয়েস্ট, আননেসেসারি ট্রাবল ডেকে আনবেন না। ফ্যান্সি গার্লের ওনারের নামটা আপনি যথাসময়ে জানতে পারবেন।

জয়শোয়ালকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ওদিক থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ ভেসে এল।

আস্তে আস্তে চেয়ারে এসে বসল জয়শোয়াল। কিচেন থেকে রুক্মিনীর উপস্থিতির ঠুংঠাং ভেসে আসছে। ওকে কি ব্যাপারটা জানানো দরকার ? একটা জিনিস জয়শোয়ালের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এই হুমকিটা ফাঁকা আওয়াজ নয়। কিন্তু ট্রাবলটা কি ধরনের হবে আন্দাজ করা শক্ত। না, বিপদের চেহারা যেমনই হোক

সেটা সহ্য করতে পারবে মিনি এ রকম আশা করাই বরং ভালো। আগে থেকেই ওকে মিথ্যে ভাবিয়ে লাভ কি? প্রথম দিন ঐ লোক-টার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হবার পর জয়শোয়াল যে অস্বস্তি বোধ করেছিল, আজ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবার পর সেটা আর তার বুকের ওপর চেপে বসে নেই। নেপথ্যে যিনিই থাকুন, তাঁর ক্ষমতা বা বাগ্যাল কাপ-এ ফ্যান্সি গার্লের হারজিতে তাঁর লাভক্ষতির প্রশ্ন কতটা জড়িত সেসব খবরে জয়শোয়াল এখন মোটেই আগ্রহী নয়, নিজের নিরাপত্তার কথাও সে ভাবছে না—ভাবতে পাবছে না। নিজের স্বভাবের এদিকটা জয়শোয়ালের অজানা নয। অনিশ্চয়তা তাকে ভাবায়, কিন্তু নিশ্চিত বিপদের সামনে সে বেপরোয়া, দুঃসাহসী। চ্যালেঞ্জ না থাকলে জীবনটা রক্তহীন, ফ্যাকাশে। তা ছাড়া অনিশ্চয়তার শূন্যে ভাসতে ভাসতে জীবিকার যে অবলম্বনটা প্রথম হাতের কাছে পেয়েছিল সেটাকেই অনিবার্যভাবে আঁকড়ে ধরতে হযেছিল—বাছাবাছি পছন্দ-অপছন্দব চিন্তাটাও হাস্যকর। জকি-জীবনে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে প্রশ্রয় দিতে গেলে বা সততা নামক বস্তুটাকে কিছু পরিমাণে জিইযে বাখতে হলে মূল্যটা কিঞ্চিৎ বেশিই দিতে হয়। সদিচ্ছা থাকলেও সাহসের অভাবে অনেককেই অনেক অসম্মানজনক আপস করতে হয়। অবশ্য যে ব্যবসার পত্তনই হয়েছে মানুষের একটা দুর্বলতার সুযোগ নেবার জন্য, সেখানে সততা আশা করাই মূর্খতা। তবু এখন পর্যন্ত জয়শোয়াল তার বিবেকটাকে খুব নমনীয় করতে পারেনি। আখেরে যে এতে তার ক্ষতি হবে তাতে সন্দেহ নেই এবং টাকাপয়সার যতটা সুবিধা এতদিনে সে পেতে পারত তাও পারেনি এই অনমনীয়তার জন্যই। জয়শোয়াল মাঝে মাঝে ভাবে—একটা নীতিহীন ব্যাপারের সঙ্গে যার অস্তিত্ব আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেছে তার এই নীতিবিলাস কেন? বোধ হয় প্রত্যেক মানুষেরই বেঁচে থাকার জন্য একটা না একটা বিশেষ লক্ষ্য মনের সামনে রাখার দরকার হয়। কেউ যে কোনো

ভাবে ক্রমাগত জীবনযাপনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে যাওয়াতেই বেঁচে থাকার লক্ষ্য খুঁজে পায়। কারো হয়তো যে কোনো ভাবে এটা পেতে রাজী না হওয়াতেই বেঁচে থাকার সার্থকতা বলে মনে হয়। জয়শোয়াল দ্বিতীয় দলের মানুষ। জীবনে দুঃখকষ্ট সে দেখেছে, তাই বোধ হয় কষ্টের দামে কেনা কিছু সুখ তার কাছে বিবেকহীন বিনা-কষ্টে-পাওয়া অঢেল সুখের চেয়ে দামী। এটুকু সে ছাড়তে রাজী নয়। এটুকু ছাড়লে, তার মনে হয়, যে হতশ্রী শুষ্কতা নেমে আসবে জীবনে, তাকে হয়তো মদ-মেয়েমানুষের অফুরন্ত বিলাসে চুবিয়ে বলা যাবে 'বেচে আছি', যেমন অনেকে বলে; কিন্তু ভালোবাসা দেবার-নেবার মনটা কি আর বাঁচবে, সেই দেয়া-নেয়ার কোমল স্পর্শটা মনে মেখে আর কি কখনো বলা যাবে 'ভালো আছি'? এবং বলে সত্যিই সুখী হওয়া যাবে?

রুক্মিণী ঘরে এসে জয়শোয়ালের চিন্তার স্থির গভীর মগ্নতায় পুকুরে ঢিল ছোঁড়ার মতো একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

—কার সঙ্গে কথা বলছিলে টেলিফোনে? সেই ভয়-দেখানো লোকটা বুঝি?

দু'চোখে একটা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন নিয়ে রুক্মিণীর দিকে মুখ তুলল জয়শোয়াল। —কি ব্যাপার বল তো? আড়িপাতার অভ্যেস করেছ নাকি?

—না, তার দরকার হয়নি। আমাকেও একটু মোলায়েম শাসানি দেয়া হয়েছে। রুক্মিণী হেসে বলল।

জয়শোয়াল অনেকটা সময় চুপ করে থেকে বলল—মিনি, তোমার কি মনে হয় রীয়্যাল থ্রেট কিছু আছে?

—আছে। লোকটার কথা বলার ধরনটা অদ্ভুত...কি রকম যেন · ···

—হ্যাঁ।...তুমি কি করতে বলবে আমাকে?

এবার উত্তর দিতে সময় নেবার পালা রুক্মিণীর।

—একেবারে ভয় পাইনি এমন কথা বলব না ··

—মিনি, স্ত্রী হিসেবে সেটাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক, জয়শোয়াল একটু হেসে বলল, মেয়েরা তো পতিদেবতাটিকে ঠাকুরঘরের পুতুলগুলির মতো চাপাচুপি দিয়েই রাখতে চায়।

—ওটা অন্যায় নয়। ও নিয়ে ঠাট্টা করাও বোধ হয় ঠিক নয়।

—আচ্ছা, আচ্ছা। আমি জানতে চাইছি তোমার কি ইচ্ছে, তুমি কি করতে বলবে আমাকে ?

অনেকক্ষণ মুখ নিচু করে যেন শাড়ির পাড়ের নকশাটাকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রুক্মিণী, তারপর মুখ তুলে তাকাল জয়শোয়ালের মুখের পানে, সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল—তুমি ব্যাক আউট করবে না। জীবনলালকে জিততেই হবে।

আস্তে উঠে চলে গেল রুক্মিণী।

কোমল একটা ইচ্ছার কুঁড়ি ফুটে উঠল জয়শোয়ালের বুকের ভেতরে। রুক্মিণীকে ডাকতে গিয়েও সে ডাকল না। কুঁড়িটার ফুল হয়ে ওঠা অনুভব করবার জন্য বসে রইল।

সেদিন বিকেলে একটা চিঠি পেল জয়শোয়াল

সাদা খামে টাইপ করে তার নাম-ঠিকানা লেখা। খাম ছিঁড়ে ভেতরে পেল ভাঁজ-করা ছোট একখানা সাদা কাগজ। ভাঁজ খুলে দেখল টাইপ করে লেখা শুধু একটি নাম—এমন একটি নাম যা জয়শোয়াল হেন লৌহস্নায়ুর মানুষেরও বুকে অকস্মাৎ একটা প্রবল ধাক্কা দিল। পা দুটো যেন কেঁপে গেল। খাম আর চিঠিটা কুচোতে কুচোতে নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল জয়শোয়াল।

টেলিফোনটা যে কিছুক্ষণ ধরে বেজে চলছে সে খেয়ালও তার হয়নি। রুক্মিণী এসে টেলিফোন ধরল—হ্যালো, কে বলছেন ?

রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে রুক্মিণী বলল—জয়, সেই লোকটা···

জয়শোয়াল আস্তে আস্তে-কেটে কেটে বলল—ডিসকানেক্ট করে

দাও। ডোন্‌ট্‌ লিস্‌ন্‌ টু এ সিংগ্‌ল্‌ ওয়ার্ড অব হোয়াট ছাট বাস্টার্ড সেজ।

* * *

অ্যাটেনড্যান্টরা লাগাম ধরে একে একে ঘোড়াগুলিকে প্যাডক-এ নিয়ে আসছে। একটু পরেই জকিরা এসে যে যার ঘোড়ার চার্জ নেবে।

প্যাডক-এর রেলিং ঘিরে জুয়াড়ীদের ভিড়। রেস শুরু হওয়ার আগে ঘোড়ার নানা লক্ষণ দেখে অনেক জুয়াড়ী সিদ্ধান্ত নেয়। দারুণ ব্যস্ততা চারদিকে। এক ঘণ্টা আগেও যে ঘোড়ার যে বাজার-দর ছিল প্যাডক-এ তার অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ করে গুণীজনেরা তার দামের চার-ছ'গুণ হেরফের ঘটিয়ে দিতে পারেন। সব বিজ্ঞ মতামতের দাম কিন্তু দৌড়ের আগেই, দৌড়ের শেষে দেখা যায় অত আঁক কষার শতকরা নব্বই ভাগই মাঠে মারা গেছে। যে দশ ভাগ মেলে সেটা যে সম্ভাব্যতার আঙ্কিক নিয়মের মধ্যেই পড়ে, তার জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন হয় না—এই অভিজ্ঞতা প্রতিটি রেসুড়েরই। তবু মাতামাতি সে করবেই। আর এই মাতামাতিটা আছে বলেই চলছে রেসের রমরমা কারবারটাও।

জয়শোয়াল জকিদের গেট দিয়ে এসে জীবনলালের কাছে দাঁড়াল। একটু যেন বেশি ঘামছে জীবনলাল। চারপাশে এত লোক-জনের ভিড় বলেই কি? স্যাড্‌ল্‌-এ চেপে অ্যাটেনড্যান্টের হাত থেকে লাগাম নিল জয়শোয়াল। রাইডিং শু দিয়ে আস্তে জীবনলালের পেটে একটু চাপ দিল। যেন দ্রুত গ্যালপ করার ভঙ্গিতে এগোতে চাইল জীবনলাল। জয়শোয়াল লাগাম টেনে তাকে আটকাল। জীবনলাল কি একটু বেশি উত্তেজিত? এতদিনের সব চেষ্টা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? আবার কি একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসবে জীবন-লাল? যে আত্মবিশ্বাসের ভরসায় মারাত্মক একটা চ্যালেঞ্জকে বুকের মধ্যে গ্রেনেডের মতো লালন করেছে জয়শোয়াল সেটা কি শেষ পর্যন্ত

বিস্ফোরিতই হবে না? জীবনলালের ব্যর্থতা মানে চরম পরাজয় জয়শোয়ালের। সে পরাজয় রেসের মাঠে নয়, কেননা কাগজে কলমে মোটেই ফেভারিট নয় জীবনলাল, পরাজয় জয়শোয়ালের নিজের কাছে। সাদা কাগজে টাইপ-করা সেই নামের মালিক ভাববে আত্মরক্ষার তাগিদেই জয়শোয়াল পিছিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত, ঘুষের দরকার হল না, শুধু হুমকিতেই কেল্লা ফতে। কিন্তু এসব কেন ভাবছে সে? শেষ মুহূর্তে কি নিজেই সে হারিয়ে ফেলল আত্মবিশ্বাস? কি করে সে ভাবতে পারল জীবনলাল বেইমানি করবে? অসম্ভব। তবু কোথায় যেন কি একটা বেসুরো বাজছে·····

ট্রেনার, ওনার আর টার্ফ ক্লাবের লোকজনদের মধ্য দিয়ে জয়শোয়াল আস্তে আস্তে জীবনলালকে স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

জয়শোয়ালের চিন্তায় এখন শুধু সাতটি অশ্ব, যাদের একটি জীবনলাল, আর চোদ্দশো মিটার দূরের ফিনিশিং পয়েন্ট। এমন কি রুক্মিণীর বসার নির্দিষ্ট জায়গাটির দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তেও সে ভুলে গেছে। অর্ধবৃত্তাকার উদ্‌গ্রীব ভিড়, কোলাহল, নানা কৌতুক ও কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্য অন্যদিন যা তাকে আকর্ষণ করে, আজ তাকে কিছুমাত্র আগ্রহী করতে পারছে না। সে তলিয়ে যাচ্ছে নিজের মধ্যে, একটা পাথরকঠিন প্রতিজ্ঞা আবার তার বুকের ভেতরে বাস্তব হয়ে উঠছে, নেই সন্দেহের দোলাচল দ্বিধা সংশয়। স্টার্টিং স্টল-এ প্রথম ঢুকল জয়শোয়াল।

···লোডিং··

···নাম্বার ফাইভ জীবনলাল ইজ ইন··সিলভার লাইনিং ইজ ইন ···নাম্বার ফোর ফ্যান্সি গার্ল ইজ ইন······

অ্যামপ্লিফায়ারে ঘোষকের একঘেয়ে উচ্চারণ।

···ব্ল্যাক প্রিন্স ইজ ইন··

·· অল ইন··

…স্টার্টার ইজ আপ…

কয়েকটা সেকেণ্ডের জন্য যেন মাঠজোড়া ভিড়টা বরফের মতো জমাট বেঁধে স্থির হয়ে গেল।

…হিয়ার দে গো…

সাতটি অশ্ব তাদের সওয়ার বিচিত্র বর্ণের পোশাকপরা জকিদের নিয়ে রঙের ফিনকি ছুটিয়ে ধাবমান। বরফ-পাহাড়ের মতো ভিড়টা যেন মুহূর্তে আবার ভেঙে-চুরে উন্মাদ, মাতোয়ারা। ঐ ধাবমান সাতটি অশ্ব যেন কয়েক সহস্র মানুষের বিচার সংযম বুদ্ধিকে তাদের খুরের আঘাতে ছিটকে-যাওয়া মাটির মতো উড়িয়ে-ছড়িয়ে দিয়ে মাতাল বেচাল নারী-পুরুষের একটা দঙ্গলে পরিণত করে তীরবেগে ছুটে চলেছে চোদ্দশো মিটার দূরের লক্ষ্যের দিকে।

শ'খানেক মিটার পর্যন্ত কেউ বড় একটা এগিয়ে যেতে পারল না। দু'শো মিটারের বাঁকের কাছটায় এসে জয়শোয়াল দেখল ফ্যান্সি গার্ল প্রায় এক লেন্‌থ্ এগিয়ে গেছে, দু'পাশে আর কেউ নেই। জয়শোয়াল চাপা গলায় বারবার বলতে লাগল—রান, মাই বয়, রান…

ফ্যান্সি গার্লের জকি ফেদারস্টোন বেপরোয়া চাবুক চালাচ্ছে। ঘেন্নায় থুতু ফেলল জয়শোয়াল। চাবুক হাতে নেয়ার অধিকার মানেই ঘোড়াকে চাবকানোর অধিকার নয়। যেসব জকি চাবুক চালিয়ে রেস জিততে চায় তারা জকি হওয়ার অযোগ্য। হঠাৎ জয়-শোয়াল লক্ষ্য করল আরেকটু যেন এগিয়ে গেছে ফ্যান্সি গার্ল। রান, মাই বয়… রাইডিং শুর হীল দিয়ে একটু জোরে জীবনলালের পেটে চাপ দিল সে। গতির একটা ঝড় তুলে ফ্যান্সি গার্লকে প্রায় দু'লেন্‌থ্ পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল জীবনলাল।

তখনই হঠাৎ জয়শোয়ালের মনে হল জীবনলালের স্টেপিং-এর ছন্দটা ঠিক থাকছে না, আর কেমন যেন একটা কাঁপন সারা শরীরে। কি হল ওর? কিন্তু ভাববার সময় এখন নেই। আবার এগিয়ে

এসেছে ফ্যান্সি গার্ল। কেদারস্টোন আর জয়শোয়ালের কাঁধে কাঁধে প্রায় ছুঁয়ে যাচ্ছে। যেমন চাবুক চলছে কেদারস্টোনের তেমনি অশ্রাব্য গালাগাল তার মুখে।

জয়শোয়াল চকিতে তাকাল জীবনলালের মুখের দিকে, অসম্ভব ফেনা গড়াচ্ছে মুখের পাশ দিয়ে, ছ'ঘণ্টা স্পার্টিং-এর পরেও যেমন ঘামায় না তার চেয়েও বেশি ঘামিয়ে গেছে এটুকু সময়েই। কি হল ওর? কেন এমনটা হল? ফ্যান্সি গার্ল প্রায় এক লেন্থ্ এগিয়ে গেছে আবার। জয়শোয়ালের ভাঙাচোরা মুখটা কঠিন পাথুরে একটা চেহারা নিয়ে ঝুঁকে পড়ল আরো সামনে, প্রায় জীবনলালের কানের পাশে তার মুখ—রান, মাই বয়, রান', উইন ইউ মাস্ট। তবু জীবনলাল পারল না গতিতে দুর্বার হয়ে উঠতে। ক্ষিপ্তের মতো জয়শোয়ালের চাবুকটা আছড়ে পড়ল এবার জীবনলালের গায়ে, এই প্রথম, একবার নয়, বারবার, যেন মরিয়া আক্রোশে নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল জয়শোয়াল।

সহসা জীবনলালের শরীরটা যেন ডানামেলা পাখির মতো উৎক্ষিপ্ত হল শূন্যে, প্রতিটি গ্যালপ-এ যেন শরীরটা তার দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে হতে একটা অবিশ্বাস্য গতির তরঙ্গ তুলে ফ্যান্সি গার্লকে পরিষ্কার তিন লেন্থ্ পেছনে ফেলে সীমানা অতিক্রম করে গেল।

ছুটে এলেন এদুলজী, সঙ্গে ওনার মিস্টার মেহতা, আরো অনেকে।

—সাবাস · ফ্যানটাসটিক ··

অভিনন্দন বাহবার শব্দগুলি ছুঁতে পারছে না জয়শোয়ালকে। তার সমস্ত মনোযোগ জীবনলালের দিকে। অদ্ভুত শান্ত জীবনলাল, ঘাড় নুয়ে পড়েছে, শুধু শরীরটা একটু একটু কাঁপছে। যেন সামান্য এই চোদ্দশো মিটারের দৌড়টা তার অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডারকে নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। এমন তো হবার কথা নয়। লাফিয়ে

স্ষ্যাডল্ থেকে নেমে পড়ল জয়শোয়াল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পা মুড়ে বসে পড়ল জীবনলাল, শরীরটা হেলে পড়ল একপাশে, থরথর করে হু'একবার কেঁপে উঠল, তারপর স্থির · ···

চারপাশের ব্যস্ততা কোলাহল অনুভব করতে পারছে না জয়-শোয়াল। সে প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাঁটু মুড়ে বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জীবনলালের মুখের দিকে। একবার শুধু বলল—হি হ্যাজ বিন পয়জনড্ · কিল্ড্ ··

অর্ধ-নিমীলিত হুই চোখ জীবনলালের। সে কি স্বপ্ন দেখছে আদিম আরণ্যক মুক্ত জীবনের! আদিগন্ত হরিৎ তৃণাকীর্ণ প্রান্তরে উচ্ছ্রিতকেশর বেগবান তেজোময় অশ্বযূথ! জীবনের মহৎ সুন্দর অনিবার্য অপরাজেয় প্রকাশ! সেই অপরাজেয় শক্তিরই কণামাত্র জীবনলাল, মরণেও সে অপরাজিত! জীবনে একবারই সে ঠিকভাবে দৌড়েছে, দৌড়েছে চিরকালীন বিজয়ীর মতো·· ··

জয়শোয়ালের জলে ভরে আসা হুই চোখের সামনে যেন ধীরে ধীরে এক বিচিত্র মহান দৃশ্যের জগৎ বাস্তব হয়ে উঠছে। জীবনলাল ক্যান নেভার ডাই, ক্যান নেভার ডাই—জয়শোয়াল মৃহু উচ্চারণে বারবার বলে চলে······

হৃদয় আদিম

[পার্থ, তোমার বিস্ময় আমি বুঝি। একজন যৌবনের প্রথমার্ধে, অন্যজন বার্ধক্যে পদার্পণ করেছেন—আমার ও সৌরেনবাবুর বয়সের এই অসমতা তোমার ও আরো অনেকের কাছে আমাদের সমবয়সীর মতো বন্ধুতাকে বিস্ময়ের বস্তু করে তুলেছে। এর পেছনের গল্পটা তোমাদের বলিনি, ভয় ছিল বলতে গেলে গল্পটা ব্যর্থ হবে, ইচ্ছে ছিল লিখে ফেলার।

শৈশবের সেই স্মৃতি আমার মনে মঙ্গলশঙ্খের মতো বাজে। আমরা পরস্পরকে পেয়েছিলাম অনেক দুঃখের মূল্যে। আমরা চেয়েছিলাম একে অন্যের একাকিত্ব দূর করতে। সবটা শুনলে বুঝতে পারবে কাজটা খুব সহজ ছিল না। ভালোবাসা কখনো অধিকারবোধ থেকে মুক্ত নয়। বিশেষ করে শিশু কি পারে এই সহজাত আদিম প্রেরণার উর্ধ্বে উঠতে?

বয়স বুদ্ধি ও শিক্ষার কিছুটা ভার নিয়ে গল্পটা আজ লিখতে বসে শৈশবের সেই আবেগ হয়তো যথাযথ আঁকতে পারব না, কোথাও কোথাও আরোপিত ব্যাখ্যা অনিবার্য হয়ে পড়বে, কাহিনীর মধ্যে যে যুক্তিগ্রাহ্য স্পষ্টতা এসে পড়বে তা হয়তো শৈশবোচিত হবে না, কেননা বয়স চিন্তায় স্পষ্টতা এনেছে। তবু গল্পটা নিয়ত মুক্তির স্বপ্ন দেখে—সব মধুর স্মৃতির যা ধর্ম।]

॥ এক ॥

বাবার মৃত্যু আমার ও মা'র জীবন সম্পূর্ণ নতুন এক খাতে বইয়ে দিল। প্রকৃতি নির্জনতা ও সচ্ছল জীবনযাত্রা থেকে আমরা নেমে এলাম এই শহরে—কোলকাতায়—মানুষের তৈরি হতশ্রী শুষ্কতা ভিড় ও অনটনের মধ্যে।

শিশু আমি তখন, এ পরিবর্তন যে কি ভয়াবহ তা বলে বোঝানো অসম্ভব। বিস্ময়ে ভয়ে আমি যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

বাবাকে ঘিরে ছিল আমাদের অস্তিত্ব—আমার ও মা'র। আকাশের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে-থাকা পাহাড়ের রাজ্যে রূপকথার দেশের মতো এক দেশে আমার দেখতে শেখার চোখ ফুটেছিল। বিস্মিত দু'টি চোখ জুড়ে ছায়াচ্ছন্ন অরণ্য, মেঘ ও রৌদ্রের বর্ণে বর্ণ-পরিবর্তনশীল অবারিত আকাশ, পাহাড়, তাদের রূপলাবণ্য আর রহস্যের হাতছানি। বাবা জানতেন কিছুতে নিবিষ্ট হতে না পারলে আমি স্বাভাবিক হয়ে গড়ে উঠব না। মানুষজনের অভাব সেখানে, বাবা তাই তিল তিল করে নিসর্গের প্রেম আমার মনে নিবিড় করে তুলেছিলেন। আমি অপলক তাকিয়ে থাকতাম দূরের পাহাড়ে, বাতাসের শব্দে অরণ্যের ভাষা পড়তে একাগ্র হতাম, অজানা রহস্যের আহ্বান শুনতে উৎকর্ণ থাকতাম। তখনো দূর থেকে ছাড়া জঙ্গল আমি দেখিনি। বাবার মুখে গল্প শুনে শুনে জঙ্গলের একটা ছবি আমার মনে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। একটা ইংরিজি ছবির বই বাবা আমাকে দিয়েছিলেন। তাতে ছিল জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়ায়-চড়া এক রাজপুত্তুরের ছবি। আকাশে সোনার থালার মতো চাঁদ, নরম বেগুনী আলোয় চারদিক জ্বলজ্বল করছে। রং-বেরংয়ের ফুলে ফুলে গাছগুলি ছেয়ে আছে। ছোট ছোট পরীরা ডানা মেলে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। একজন রাজপুত্তুরের কাঁধে বসে গান শোনাচ্ছে। আমার মনে অরণ্যের যে ছবি আঁকা হয়েছিল তাতে এ ছবিটার ভূমিকা বড় কম ছিল না। বাবা আমাকে শুনিয়েছিলেন জন্তু-জানোয়ারের গল্প, তাদের চালচলন হিংস্রতা আর মজার মজার স্বভাবের কথা। মনে মনে আমি হাতির পিঠে সওয়ার হতাম, বড় বড় বাঘ আমার বন্দুকের গুলিতে মুখ থুবড়ে পড়ত, চিত্রিত হরিণের দল দেখলে কিন্তু আমি মুগ্ধ চোখে বন্দুক নামিয়ে রাখতাম, আমার হাতের অব্যর্থ লক্ষ্যে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ছুরির ফলায় গাঁথা হয়ে যেত গোক্ষুর সাপের ফণা। তারপর বিজয়ী রাজপুত্র, আশ্চর্য সুন্দর পরীরা আর বিশাল বৃক্ষের কোটরে মায়াবিনীর চক্রান্তে

বন্দিনী রূপসী রাজকন্যার অস্ফুট বাসনাও ছিল। এমনি করে আমার মনের গহনে এক মোহনীয় ভুবন রূপময় হয়ে উঠেছিল। এই জগৎ আমার কাছে ছিল বড়ই প্রত্যক্ষ, কারণ চোখের সুমুখেই ছিল এর বাস্তব পটভূমি—পাহাড় অরণ্য বৃক্ষরাজি পুষ্প লতা। আর এসবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ করিয়ে দেবার জন্য একটি মধুর ব্যক্তিত্ব—আমার বাবা—আমার ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ। এক আশ্চর্য ভালোবাসায় তিনি আমাকে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি জানতেন মানুষকে জয় করার জাদুমন্ত্র। আমাকে তিনি জয় করেছিলেন। বাবার প্রতি আমার সম্মোহিত ভালোবাসার অনুরূপই যে তাঁর প্রতি মায়ের ভালোবাসাও, এই স্বতোৎসারিত বোধ আমার হৃদয়ে ছিল। মা ও আমি বাবার প্রতি ভালোবাসায় অদ্ভুত একাত্ম ছিলাম। আর তিনি ছিলেন আমাদের হৃদয়ে সর্বময়।

একদিন সহসা তাঁর সর্বময় উপস্থিতির অবসান ঘটল। তাঁর মৃত্যু হল। ভূমিকম্প, প্রমত্ত হাতির পাল ও বিধ্বংসী প্লাবনের সমবেত আক্রমণে বিপর্যস্ত মানুষের মতো সেই মৃত্যুর প্রাথমিক উপলব্ধি আমার মনে। বহুদিন পর্যায়ক্রমে একটা বিভ্রান্তি ও শূন্যতার কবলিত হয়ে রইলাম আমি। তারপর ধীরে ধীরে আবার নিসর্গে ফিরে গেলাম, আশ্রয় পেলাম। সেখানে যেন বাবার জন্য শোক ব্যাপ্ত ছিল, আমার জন্য ছিল সহানুভূতি। আমি সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম, সহজ হয়ে আসছিলাম।

দু'টি বছর কেটে গেল। একদিন শুনলাম আমাদের চলে যেতে হবে—অনেক দূরে—শহরে—কোলকাতায়।

পৃথিবীটা যে এ জায়গার বাইরেও ছড়ানো তা আমি জেনেছিলাম। কিন্তু আমার ধারণায় তাও ছিল এখানকার অনুরূপ—হয়তো বৈচিত্র্যে ও বিরাটত্বে আরো উজ্জ্বল, আরো সুন্দর। কারণ বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় তা বাবার মুখ থেকেই। বাবা আমাকে শহর কারখানা ধোঁয়া যন্ত্র ও অপরিসর

পৃথিবীর কথা শোনাননি। আমার তাই ধারণা ছিল পৃথিবীটা বুঝি শুধুই কঙ্গোর প্রবহমান জলধারা, আফ্রিকার ভীষণ-সুন্দর নীরন্ধ্র অরণ্যের অন্ধকার, কালাহারির ধূসর আদিগন্ত প্রসার, হিমালয়ের উত্তুঙ্গ তুষারশুভ্রতা আর অসংখ্য অভাবনীয় বর্ণের পুষ্প লতা তৃণ বৃক্ষ, বিচিত্রিত পাখি হরিণ প্রজাপতির সমাবেশ।

স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে আমি তাই ভীষণ অসহায় বোধ করলাম। বাঘের মুখে পড়েও বোধ হয় এতটা বিচলিত হতাম না, যেহেতু বাঘের সামনে বন্দুক উঁচিয়ে ধরার মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল, অথচ এই নতুন জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ানোর কথা আমার কল্পনায়ও কোনোদিন আসেনি। স্টেশন প্লাটফর্মের ভীষণ ব্যস্ততা কোলাহল ও ভিড়, লোহা ও ইটের ফ্রেমে চড়ানো স্টেশনের বিরাট উচ্চতা, নিষ্প্রাণ লাল ও সাদায় ছোপানো দেয়াল ঘর আমার একেবারেই অচেনা। মায়ের হাত ধরে হতবুদ্ধি আমি স্টেশনের বাইরে এলাম।

কেউ আমাদের নিয়ে যেতে স্টেশনে আসেনি। নিকটাত্মীয় বলতে আমার একমাত্র মামা তখন ফরেন সার্ভিসে বিদেশে। পিতৃকুলে বাবা ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয়। এখন থেকে আমাদের সব দায় দায়িত্ব মা'র একলার। জানাশোনা কারুর সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে মা একখানা ঘরের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সম্বল বলতে ছিল বাবার অফিস থেকে পাওয়া কিছু টাকা।

'আমরা ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসলাম। মা গাড়োয়ানকে একটা ঠিকানা বলে দিলেন। গাড়ি চলল। দোতলা বাস, ট্রাম, বাড়ির পর বাড়ি, সারি সারি ঝকঝকে দোকানপাট আর কত রকমের যে মানুষ ছায়াছবির মতো সরে সরে যেতে লাগল! বিহ্বলতার ভাবটা কেটে গিয়ে আমি যেন একটু একটু করে উৎসুক হয়ে উঠছিলাম। মনে হচ্ছিল এসব আমার ভালোই লাগবে।

দেখতে দেখতে আমরা একটা ঘুপসি গলির মধ্যে এসে পড়লাম।

বহুকাল চুনকাম না হওয়া নোনাধরা সব বাড়ি, পলেস্তারা উঠে গিয়ে ইট বেরিয়ে আছে, ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি বাড়িগুলো যেন জড়াজড়ি করে নিজেদের দাঁড় করিয়ে রাখতে চাইছে। নোংরা সরু রাস্তা, জঞ্জালে ভর্তি। আমার কৌতূহল ঝিমিয়ে পড়েছে, কেমন ভয়-ভয় করছে। বুকের মধ্যে চাপ বোধ হচ্ছে যেন।

আমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে মা নেমে গিযে নম্বর দেখে একটা বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লেন। দরজা খুলে দিল একটা বুড়ি। মা বুড়ির সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

গলিতে ছেলেরা বল খেলছিল। আমি ওদের খেলা দেখতে গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালাম।

বলটা গড়িয়ে গড়িয়ে গাড়ির কাছে আসতে একটা ছেলে আমাকে বলল—এই ছোঁড়া, বল খেলবি ?

আমার বয়সী ছেলে, কিন্তু তার কথা বলার ধরন আমার অদ্ভুত অচেনা মনে হল। বোকার মতো বললাম—এখন না, পরে খেলব।

বিশ্রীরকম দাঁত খিঁচিয়ে হাসল ছেলেটা—পরে খেলব! লে লে, কে নিচ্ছে তোকে খেলায়। এই দেখ্ নস্তে, আহুরে গোপাল কেমন লাল সিল্কের জামা গায় দিয়েছে।

আবার গা-জ্বালানো বিশ্রী হাসি—একা নয়, এবার নস্তেও যোগ দিয়েছে।

আমার ভীষণ খারাপ লাগল। জামাটা বাবা আমাকে দিয়েছিলেন। ছেলে দু'টিকে আমার নিষ্ঠুর উৎপীড়নকারী বলে মনে হল, আমি গাড়ির ভেতরে সরে এলাম। আমার কান্না পেল।

বুড়ির সঙ্গে কথা বলে মা ফিরে এলেন। গাড়োয়ানকে বললেন মালপত্র উঠিয়ে দিতে।

গর্তওলা এবড়োখেবড়ো উঠোন পেরিয়ে মা'র হাত ধরে ওপরে যাবার সিঁড়ির মুখে পৌঁছলাম। বুড়ি আঁচলে ভেজা হাত মুছতে মুছতে আমাদের কাছে এল, আমার চিবুক ধরে আদর করল।

বুড়ির চুল ঝুটি করে বাঁধা, সামনের কয়েকটা দাঁত নেই, বাকি দাঁত-গুলোয় কালো কালো ছোপ, বুক দুটো মস্ত মস্ত। বাড়িটার মতো বুড়িকেও আমার পছন্দ হল না। আমি পুরনো বাড়ির গন্ধ পাচ্ছিলাম, বুড়ির গা থেকেও যেন। বুড়ি আমার চিবুক ছুঁতে আমি মায়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

বুড়ি চক্ করে চুমু খেয়ে বলল—এইটি তোমার ছেলে বুঝি। বাঃ, বেশ ছেলে, বেঁচে থাকুক। আমি তোমার দিদিমা হই গো, চল তোমাদের ঘর দেখিয়ে দি।

ঘর দোতলায়। সিঁড়ির অবস্থাও উঠোনের মতোই ভাঙাচোরা। দিনের বেলায়ও অন্ধকার। আমি হোঁচট খেলাম। বুড়ি হা-হা করে এসে হাত ধরল—লাগল বাছা?

উত্তর দিলাম—না।

—লেগেছে? মা বললেন।

আমি মাথা নাড়লাম।

—ঘরদোর ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে, কে দেখে, কার দায় পড়েছে, যে যার তালে আছে। ছেলেরা গো, আমার ছেলেরা। মানুষ নাকি একটাও! সব বাপের ধারা পেয়েছে, টাকাপয়সা ওড়াতেই শুধু শিখেছে। উনি তো ফুকত করে সরে পড়লেন, আমি মাগী এখন ঠেলা সামলাই। ঘর খুলে দিতে দিতে বুড়ি বক-বক করে চলল, তুমি বাছা ডলির বন্ধু, আপনজনদের মতো, নিজের বাড়ি মনে করে থেকো। ওপাশটায় নিজে থাকি বলে অ্যাদ্দিন ঘরটা ভাড়া দিইনি, খালিই পড়ে ছিল। তোমাদের মা-ব্যাটার সংসার, ঝামেলা নেই কিছু, তাই দিলাম। ভাড়াটা কিন্তু মাসপয়লা দিয়ে দিও বাছা, আমি আবার চাইতে পারিনে—

বুড়ি চলে যেতে আমি মাকে শুধোলাম—বুড়িটা কে মা?

—ও কি কথা খোকন? বুড়িটা? ওঁকে দিদিমা বলবে। এ বাড়িটা ওনার।

বাক্স বেডিং তুলে দিয়ে ভাড়া নিয়ে গাড়োয়ান চলে গেল। মা গোছগাছ করতে লেগে গেলেন।

আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। উঠোনের দিকে তাকালাম। বিশ্রী উঠোনটা। জায়গায় জায়গায় গর্ত। কালচে-সবুজ শেওলা। ঝাঁজরির কাছে নোংরা জল জমে আছে। একটা কলের মুখ থেকে তিরতির করে জল পড়ছে। বালতি বসানো নিচে। পাশে একটা বৌ দাঁড়িয়ে। বৌটা মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছে। উঠোনের চারদিকে ছোট ছোট বারান্দাওলা ঘর—চাপা, অন্ধকার। ছ'তিনটে বৌ বারান্দায় রাঁধছে। একটা বুড়ো হাঁসফাঁস করছে ঘরের ভেতরে। ছোট ছোট কয়েকটা ছেলেমেয়ে বারান্দায়, উঠোনে, জানলায়। সবার চোখ ওপরের দিকে। আমি একবার সার্কাস দেখেছিলাম। এরা সব যেন ওপরের দিকে তাকিয়ে সার্কাসের ট্রাপিজের খেলা দেখছে। আমার যা-তা বলে দিতে ইচ্ছে করল। ভেংচি কাটবার কথাও মনে হল। পারলাম না ছটো কারণে। আগে কখনো অমন অদ্ভুত ইচ্ছে করেনি বলে। তা ছাড়া একটু আগেই 'বুড়িটা' বলায় মা আমার ওপর রাগ করেছেন। ও রকম অসভ্যের মতো কথা কখনো বলিনি আগে, কেন যে বলেছিলাম তা ভেবে আমার অবাক লাগছিল আর লজ্জাও করছিল। সব যেন কেমন উলটে-পালটে যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। ঘরে মা গোছগাছ করছেন। আমার বয়সী ছ'টি ছেলে নোংরা মেখে বাড়ি ফিরল। হাত-পা না ধুয়েই চিৎকার করে খেতে চাইল একজন। আরেকজন বোনের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি শুরু করে দিল। ওদের মা ছ'জনকেই খুব পিটুনি দিল। উঠোনের গর্তগুলি অন্ধকারে ঢেকে গেল। ঘর গুলিতে ভুতুড়ে আলো জ্বলে উঠল। ধোঁয়ায় ঝুলে কালো দেয়ালে ক্যালেণ্ডার ঝুলছে, বিছানা তোরঙ্গ হাঁড়ি কলসিতে ঘর ঠাসাঠাসি, সবগুলি ঘরের ভেতরে প্রায় একই রকম।

—খোকন, ঘরে এসো। মা ডাকলেন।

ঘরে গেলাম। ছোট ঘর, তবে নিচের ঘরগুলির মতো দেয়াল তত কালো নয়। দু'দিকে দুটো জানলা।

প্যান্ট শার্ট ছাড়িয়ে মা আমাকে গেঞ্জি ইজের পরিয়ে দিলেন।

—এখন থেকে আমরা এ বাড়িতে থাকব। মা যেন আপন মনেই বললেন।

মা কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারলাম না। কোনো কথা না বলে একটা জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দূরের দিকে তাকাতে চাইলাম। কিন্তু তিন হাত চওড়া গলির ওদিকে একটা বাড়ি ধমকের মতো দাঁড়িয়ে। অন্য জানলায় গেলাম। সেখানেও আরেকটা দেয়াল। আমি ঘুরে মাকে খুঁজলাম।

মা ঘরে নেই। রান্নাঘরে গেছেন হয়তো।

হঠাৎ ভীষণ ভয় করতে লাগল আমার। আমি নিজেকে পরিত্যক্ত বোধ করলাম!

॥ দুই ॥

বাবার ছবি এনলার্জ করে দেয়ালে টাঙানো হল। মা ফুলের মালা কিনে এনে পরিয়ে দিলেন।

মাকে প্রায়ই দেখতাম বাবার ছবির সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে। আমি লক্ষ্য করছি বুঝতে পারলেই সরে যেতেন। আমি বাবার ছবিকে প্রণাম করতাম। মা কিন্তু প্রণাম করতেন না। আমাকে কেউ প্রণাম করতে শিখিয়ে দেয়নি, নিজে থেকেই করতাম।

এখানে এসে আমার বায়না বেড়েছিল, ছুতোনাতায় কেবলই মাকে বিরক্ত করতাম, বাবা আর পুরনো দিনের গল্প বলার জন্য তাঁকে উত্ত্যক্ত করতাম। মা আমাকে মাঝে মাঝে বকুনি দিতেন, তাঁকে বিরক্ত না করতে বলতেন। কিন্তু আমি বুঝতে চাইতাম না।

আমি কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলাম না। মনোনিবেশ করার মতো কিছু আমার ছিল না।

সমবয়সী যে দু'টি ছেলে ছিল একতলার ভাড়াটেদের তাদের আমার মোটেই ভালো লাগত না। ওদেরই একজন আমাকে ঠাট্টা করেছিল বল খেলার কথা বলে। ছেলে দুটো আমাকে দেখলেই কিল দেখাত আর ভেংচি কাটত। আমার নিচে যাওয়ায় মা'র বারণ ছিল। মা নিজেও বাড়ির কারো সঙ্গে বিশেষ মিশতেন না। বেশ বুঝতে পারতাম এক বাড়িতে থাকলেও মা অন্যদের আমাদের সমান ভাবতে পারেন না।

মাকে খুব খাটতে হত। একা হাতে সব কাজ করতেন। দশটার মধ্যে আমাকে খাইয়ে নিজেও দু'টি খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। মা চাকরি খুঁজছিলেন। বেরুবার সময় বলে যেতেন—দুষ্টুমি করো না। ঘুমিও। ঘুম না পেলে বই পড়ো। নিচে যেও না কিন্তু। জলখাবার ঢাকা দেয়া আছে, আমার ফিরতে দেরি হলে খেয়ে নিও।

বাড়িউলি বুড়িকে বলতেন—একটু দেখবেন।

মা বেরিয়ে গেলে সারাটা দুপুর যে আমার কি করে কাটত!

ঘুম আসত না। খানিকক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে জানলার কাছে গিয়ে বসতাম। চোখ আড়াল করে দাঁড়িয়ে-থাকা বাড়িটার দিকেই হয়তো তাকিয়ে থাকতাম। চুনবালি খসে গিয়ে জায়গায় জায়গায় ম্যাপের মতো, মরচে-ধরা জলের পাইপ—যে কোনো সময় খসে পড়তে পারে, কার্নিশের নিচে অশ্বত্থগাছের চারা—জালের মতো শিকড় ছড়িয়েছে। দেয়ালটা দেখতে দেখতে মুখস্থের মতো হয়ে গেল। হঠাৎ ছুটে বারান্দায় যেতাম, রেলিংয়ের শিকের মাঝখান দিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতাম। দুপুরে পুরুষেরা কাজে আর ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলে চলে গেলে শুধু বুড়োবুড়ি বৌরা আর একদম বাচ্চারা, যাদের ইস্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি, বাড়িতে থাকত। উঠোনে

বাসনের ডাঁই জমে উঠত, কয়েকটা বেড়াল আর কাক বাসন টানাটানি করে খাবার খুঁজত। কোনো কোনো দিন বৌগুলো জল নিয়ে ঝগড়া করত। আবার এ ওর ঘর থেকে কাপে করে চিনি, শিশিতে করে তেল চেয়ে নিয়ে আসত, নিজেদের মধ্যে ওরা জিনিসপত্রের দাম আর টানাটানির কথা নিয়ে আলোচনা করত, দোকানদার গভরমেণ্ট আরো সব কাকে কাকে গালাগাল দিত, বিশেষ করে 'মুখপোড়া' কথাটা ওরা হরদম বলত। প্রথম প্রথম ওরা যেমন আমাদের দিকে বোকা-বোকা চোখে তাকিয়ে থাকত, আস্তে আস্তে সেটা বন্ধ হয়েছিল। তাই আমারও ওদের আর তেমন খারাপ লাগত না। দু'একটা বৌ মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথা বলত খোকন তোমার খাওয়া হয়ে গেছে? তোমার মা বেরুলেন বুঝি? তোমরা আগে কোথায় থাকতে? এইসব আজে-বাজে কথা। তারপর ওরাও খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। আমি তখন কি করব ভেবে ঠিক করতে পারতাম না।

বাড়িউলি বুড়ি ফাঁকে ফাঁকে আসত।—কি গো দাদু, একা একা মন কেমন করছে বুঝি। এসো না, আমার ঘরে এসো, দু'জনে বসে কথা কইব।

বুড়িও একা, ওর ছেলেদের বাড়িতে দেখাই যেত না, মেয়েদের দূরে দূরে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বুড়ির চেহারাটাই আমার অপছন্দ, ও আমাকে আদর করলে আমার গা ঘিনঘিন করত। বুড়ি ডাকলে আমি তাই 'এখন ঘুমোব' এ ধরনের কিছু বলে পাশ কাটাতাম।

খেয়ে-দেয়ে বুড়ি ঘুমিয়ে পড়ত।

তখন শুধু নিচের হাঁপানি-বুড়োর হাঁসফাঁস শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ পাওয়া যেত না। এর চেয়ে অনেক নির্জন জায়গায় আমরা ছিলাম। কিন্তু চার দেয়ালের মধ্যেকার নির্জনতা আর পাহাড় প্রান্তর অরণ্যের নির্জনতা এক নয়। বই নিয়ে পড়বার চেষ্টা

করতাম—আমার প্রিয় ছবির বইগুলি। কিন্তু শব্দ আর ছবিগুলি যেন তাদের আগেকার উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছিল। তখন বাবাকে আমার ভীষণ মনে পড়ত। আমি চুপি চুপি কাঁদতাম। কোনো কোনো দিন কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়তাম। মা এসে ডেকে তুলতেন, আদর করতেন, খাবার খাইনি বলে একটু বকতেন, তারপর, নিজে হাতে খাইয়ে দিতেন। এ সময় প্রায়ই আমার দারুণ ক্লান্তি লাগত. যেন সারাদিন কত পরিশ্রম করেছি, পড়তে বসে আবার ঘুমিয়ে পড়তাম।

মা'র বন্ধু ডলিমাসি, যে এই বাসাটা ঠিক করে দিয়েছিল, একদিন বেড়াতে এল।

ডলিমাসি বাড়িউলির বোনঝি। মা'র সঙ্গে ইস্কুলে কলেজে পড়েছে। ডলিমাসির বিয়ে হয়নি। কোলকাতার কাছেই মেয়েদের একটা ইস্কুলে মাস্টারি করে, হস্টেলে থাকে। ফর্সা মোটাসোটা গোলগাল মানুষটি। হাসি-হাসি মুখ। ডলিমাসিকে দেখে মনে হল ও খুব আমুদে। কিন্তু ডলিমাসি প্রথমে যে কাণ্ডটা করল সেটা কিন্তু ঠিক তার উলটো। কোনো কথা না বলে মা'র মুখোমুখি একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। মাও কাঁদলেন। ব্যাপারটা পুরো বুঝতে না পারলেও আমারও কান্না পেয়েছিল, আর সেই কান্নার জন্যেই ডলিমাসিকে আমার আরো ভালো লেগেছিল।

কান্না থামলে পর ডলিমাসি আমাকে আদরে আদরে উস্তনপুস্তন করে ছাড়ল। কান্নাভেজা গাল আমার গালে চেপে রাখল, চুমু খেল, কতবার যে বুকে জড়িয়ে ধরল। আর কত কথাই যে বলে গেল—তুমি জান না খোকন, তোমার মা আর আমি কি ভীষণ বন্ধু ছিলাম। তোমার মা'র যখন বিয়ে হয়ে গেল আমার তখন কি

কান্না কি কান্না। তোমাকে যে আমার কি দারুণ দেখতে ইচ্ছে করত খোকন—

মা হেসে বললেন—কি রে, আমি যে কেউ-না হয়ে গেলাম।

—দাঁড়া, তুই তো পুরনো মানুষ।

এ-ই ডলিমাসি। বেশি কথা বলে। বড্ড আবেগপ্রবণ। দয়া মায়া একটু বেশি প্রাণে। তবু ঐ সুখী আত্মতৃপ্ত হাসিখুশি চেহারাটির অন্তরালে একটা দুঃখের অনুভবযোগ্য অস্তিত্ব ছিল। আমি জানতে পারিনি কি সে যন্ত্রণা, জানার মতো বয়সও আমার নয় তখন। কিন্তু সব মিলিয়ে ডলিমাসিকে আমার খুব কাছের খুব আপন মনে হয়েছিল।

চেষ্টা-চরিত্র করে ডলিমাসি মেয়েদের একটা ইস্কুলে মা'র মাস্টারি জুটিয়ে দিল। নিঃসঙ্গ দুপুরগুলি এবার আমার দুঃসহ হয়ে উঠল। যতদিন মা'র চাকরি হয়নি, যদিও তখনো সারাটা দুপুর প্রায়ই তাঁর বাইরে বাইরেই কাটত, তবু কোথাও যেন একটা ক্ষীণ সান্ত্বনা ছিল আমার মনে। কিন্তু মা'র চাকরি হতে সেই সান্ত্বনাটা একেবারেই হারিয়ে গেল। মা যেন অনেক দূরে চলে গেলেন। সারাটা দুপুর আমার এক অদ্ভুত অস্বস্তির মধ্যে কাটত। ছটফট করতে করতে এ জানলা থেকে ও জানলায়, ঘর থেকে বারান্দায় ছুটে ছুটে যেতাম, প্রতিবারেই মনে হত ওখানে গেলে নিশ্চয় আমাকে চমকে দেবার মতো কিছুর দেখা পাব, কিন্তু সেই একই পুরনো দেয়াল, একই নোংরা উঠোন, বৈশিষ্ট্যহীন অনেকবার-দেখা মুখগুলি ছাড়া আর কিছুই বরাতে জুটত না। বিছানায় শুয়ে হাত-পা ছুঁড়তাম, কাগজ ছিঁড়ে কুটি কুটি করতাম। আমি স্বপ্ন দেখতে ভুলে গিয়েছিলাম।

একতলার হাঁপানি-বুড়ো হঠাৎ একদিন দুপুরে মরে গেল। চিৎকার করে কাঁদল বাড়ির মেয়েরা, বাচ্চাগুলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। পাড়ার বড় বড় ছেলেরা প্যান্টের পা গুটিয়ে

গামছা-কাঁধে মড়া নিয়ে যেতে এল। ওরা হুসহুস করে সিগারেট টানছিল, হাসছিল, চেঁচামেচি করছিল। ওরা যেন বেশ মজা পাচ্ছিল। মড়াটা বুড়ো বলেই বোধ হয়। ঘর থেকে বুড়োকে বের করা হল। হাড্ডিসার বুড়োর চোখের জায়গায় শুধু দুটো কালো গর্ত যেন। বুড়োর বুড়ি চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল। পাড়ার ছেলেদের একজন বলল—'চ বে, ঠাক্‌মাকেও লিযে যাই, একসঙ্গে সগ্‌গে চলে যাবে।' ছেলেরা হেসে উঠল। বুড়োর পাশের ঘরের যে মেয়েটা শাড়ি পরে সে একটা ছেলের দিকে তাকিয়ে কি রকম যেন হাসল, ছেলেটাও হেসে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিগারেটে জোর টান দিয়ে পাশের বন্ধুকে কনুই দিয়ে খোঁচা মারল। দু'জনে গলা জড়াজড়ি করে কানে কানে কথা বলতে লাগল, ওদের চোখ কিন্তু সারাক্ষণ মেয়েটার দিকেই ছিল। বুড়োকে খাটিয়ায় তুলে গলা ফাটিয়ে 'বল্‌অ হরি, হরি বোল্' দিতে দিতে ওরা চলে গেল। উঠোনে কয়েকটা ফুল আর খানিকটা দড়ি পড়ে রইল।

সেদিনের দুপুরটা উত্তেজনায় চমৎকার কেটেছিল। কিন্তু একজনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে আমার এই মনোভাবে যেন কেমন বিব্রত ও লজ্জিত হচ্ছিলাম। আমি তো এমন ছিলাম না!

বেলা যত বাড়ত, আমার অস্থিরতাও বাড়ত। মন থেকে যেন শরীরে ছড়িয়ে পড়ত সেই অস্থিরতা। চোখ জ্বালা করত। গা গরম হযে উঠত। মনে হত জ্বর হয়েছে। কিছু ভালো না লাগার যন্ত্রণা সেই শৈশবেই আমাকে অধিকার করল। আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলাম। অকারণে মা'র 'পরে রাগ হত, রোজ বিকেলে ফেরার সময় মা আমার জন্য চকোলেট সন্দেশ ফল নিয়ে আসতেন, তবুও। আমার যে দুপুরে জ্বরের মতো হয়, বুকের ভেতরে গলায় কি রকম করে তাও রাগ করে মাকে বলিনি।

॥ তিন ॥

একা একা থাকতে আমার ভালো লাগে না বুঝে মা বললেন—খোকন, আসছে বছর তোমাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেব।

—হুঁ। যদিও মাকে বিশেষ উৎসাহ দেখালাম না, তবু এটা আমার কাছে খুব আশার কথা হয়ে রইল পরের কিছুদিন।

এমন কি গায়ে পড়ে বাড়িউলি বুড়িকে খবরটা দিয়ে এলাম—জান দিদিমা, আসছে বছর আমি ইস্কুলে ভর্তি হব।

—হবে বই কি দাদু, নিশ্চয় হবে, বুড়ি আমাকে কোলে টেনে নিয়ে বলতে লাগল, কত বড় লেখাপড়া-জানা বাপের ব্যাটা তুমি, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, বাপের নাম রাখবে।

বাবা মা আর আমার অনেক সুখ্যাতি করে বুড়ি তারপর নিজের ছেলেদের গাল পাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত কপাল চাপড়ে কান্না। বুড়ি এমন পাগলের মতো করছিল যে আমি কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ক'দিন আগে বুড়ির দুই ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে। ওরা নাকি কোকেন না কি সবের চোরাই চালানের কাজ করে।

বেকুবের মতো অবস্থাটা কাটিয়ে বুড়িকে বললাম—তুমি কেঁদো না দিদিমা। আমি রোজ তোমার সঙ্গে গল্প করব।

—আহা রে বাছা। বলে বুড়ি আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।

গায়ে পুরনো বাড়ির গন্ধ সত্ত্বেও বুড়ির সঙ্গে সেদিন থেকে আমার ভাব হয়ে গেল। আমরা পাশাপাশি বসে সুখদুঃখের কথা গড়গড় করে বলে যেতাম। বুড়ি ছিল আমার দারুণ গুণগ্রাহী। আমি বুড়িকে আমার দেখা পাহাড় জঙ্গল আর বাবার কাছে শোনা গল্প শোনাতাম। বুড়ি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনত। তারপর নিজের পোড়া অদৃষ্টের গল্প বলতে বলতে কাঁদত, স্বামীকে আর ছেলেদের গালাগাল করত। আমি তখন খুব গম্ভীর মুখ করে বসে থাকতাম।

ডলিমাসি মাঝে মাঝে আসত। ও এলে খুব আমোদ হত। বড্ড আদর করত ডলিমাসি, আদরের চোটে হাঁপ ধরে যেত আমার, তবু ওকে যেতে দিতে ইচ্ছে করত না।

মা, ডলিমাসি, বাড়িউলি দিদিমা আর নিচের তলায় একটা ছোটখাট বৌ, যার মুখখানা ভারি মিষ্টি আর আমাকে দেখলেই যে হাসি-হাসি মুখ করে চেনা মানুষের মতো তাকাত—এদের জন্য এই বিচ্ছিরি বাড়িটাও আমার একটু একটু করে সয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু একদিন আবার সব অন্যরকম হয়ে গেল।

সেদিন দুপুরে বাড়িউলি দিদিমা তখন খেতে বসেছে, আমি চুপ করে শুয়েছিলাম। দিদিমার খাওয়া হলে গল্প করতে যাব। শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার কাশি পেল। দমকে দমকে কাশি। শুয়ে থাকতে পারলাম না, উঠে বসলাম। তবু কাশি কমল না। কমল খানিক পরে, বুকের মধ্যে কি যেন একটা ছিঁড়ে গেল মনে হতে। সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়ে খানিকটা কি ছলকে উঠল—নোনতা, গরম। সেটুকু ফর্সা বালিশের ওপর পড়ে গেল। রক্ত—লাল, টকটকে লাল রক্ত। আমি জানতাম গলা দিয়ে রক্ত উঠলে মানুষ আর বাঁচে না। বাবারও কাশির সঙ্গে রক্ত উঠত, তাতেই তিনি মারা গেছেন।

নিমেষে আমার মনে ভেসে উঠল খাটে-শোয়ানো ফুলে-সাজানো মৃতদেহের ছবি। দু'টি মৃত্যু আমি দেখেছি। বাবার মৃত্যুর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া আমার মনে এক অবুঝ নিরুদ্ধ অভিমান, যেন এমনটা করা বাবার উচিত হয়নি। তারপর অপরিসীম দূরত্বের একটা যন্ত্রণা। মৃত্যু যেন জমাট অন্ধকারের একটা দেয়াল, এমন উঁচু যেন কোন্ পাতাল থেকে উঠে আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার ওদিকে বাবা, তাঁর কোনো কথা কোনো-দিনই ঐ দেয়াল পেরিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। অথচ হাঁপানি-বুড়োর মৃত্যু আমার খুবই স্বাভাবিক মনে

হয়েছিল, খুবই সঙ্গত। বোধ হয় তার মৃত্যুটাকে আমি উপভোগই করেছিলাম। এটা স্বাভাবিক নয়। তবু একঘেয়েমির চাপে ক্লান্ত আমার মন এভাবেই বুড়োর মৃত্যুটাকে দেখেছিল। সে যা-ই হোক, মৃত্যুর ভীতিজনক দূরত্বের একটা বোধ সেই বয়সেই আমার জন্মেছিল।

রক্তের দাগের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ জলে ভরে গেল। হাত-পা অসাড় হয়ে এল, কান্নায় বুক ব্যথা করতে লাগল, পৃথিবীশুদ্ধু সবার 'পরে ভীষণ অভিমান হতে লাগল। আমি মরে যাব, সবাই যেন চাইছে আমি মরে যাই। ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে দিশেহারা হয়ে বাড়িউলি দিদিমার চোখ এড়িয়ে নিচে নেমে এলাম, রাস্তায় নেমে পাগলের মতো ছুটতে লাগলাম একদিকে। আমাকে কেউ চায় না, তাই তো আমি মরে যাচ্ছি। আর মরেই যখন যাচ্ছি, তখন শুনব না কারুর কথা, যা ইচ্ছে করব, যেখানে ইচ্ছে চলে যাব। খেপার মতো ছুটে চলেছি, রোদ্দুরে রাস্তার পিচ গলে উঠেছে। জুতো পরে বেরুইনি, পা পাতা যাচ্ছে না রাস্তায়। আমি জোরে আরো জোরে ছুটছি। ঘামে শরীর ভেসে যাচ্ছে। জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে। কোনোদিকে তাকাচ্ছি না, কোনো কিছুরই আর কোনো মানে নেই। একটা প্রবল অভিমান শুধু আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। অথবা অর্থহীন কোনো দুরাশা —মৃত্যুর প্রসারিত হাত থেকে বুঝি এভাবেই পালাতে পারব।

কতদূর বা কতক্ষণ ছুটেছি মনে নেই। গলা শুকিয়ে জিভ টেনে ধরেছে। মনে হচ্ছে জিভটাকে কেউ সাঁড়াশি দিয়ে ভেতরের দিকে টানছে। রাস্তার ধারের একটা কল থেকে সরু ধারায় জল পড়তে দেখে ছুটে গিয়ে নলটা মুখে পুরে চুষতে লাগলাম।

অনেকটা জল খেলাম। হঠাৎ কি রকম শীত করতে লাগল, আর মাথার মধ্যেটা যেন ফাঁপা। আস্তে আস্তে খানিকটা হেঁটে গেলাম। তারপর পা দুটো এলোমেলো পড়তে লাগল, সামনে আর

মাটি নেই যেন·· সব ফাঁকা, শরীরটা দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে উঠল, চোখের সামনে অগুনতি মেটে হলুদের ছোপ, তারপরই চারদিক অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

॥ চার ॥

জ্ঞান হতে ওষুধের ঝাঁজালো গন্ধ পেলাম। প্রথমে দেখলাম মাকে। শুকনো মুখ, রুক্ষ চুল—মাকে দারুণ ভীতু দেখাচ্ছে। আমার মায়া হল, একটু হাসতে চেষ্টা করলাম। কারো 'পরেই আমার আব অভিমান নেই, সবাইকে ক্ষমা কবতে পেরেছি। আমি আর বাঁচব না যে।

মা আমার কপালে হাত বেখে ডাকলেন ডলি ···

ডলিমাসি ঘরে ঢুকে বিছানায় বসল।

মা শুধু আরেকবার 'ডলি' বলে আর কিছু বলতে না পেরে জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

মাকে মিষ্টি করে একটু ধমক দিল ডলিমাসি—ছি। তারপর হাসি-হাসি মুখ কবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি বড় দুষ্টু হযেছ খোকন। দেখ দিকি আমাদের কি ভীষণ ভাবনায় ফেলে-ছিলে। ইস্কুল ছুটি নিয়ে আমাকে থাকতে হচ্ছে এখানে।

বললাম—বেশ হয়েছে।

—তবে রে দুষ্টু ··। ডলিমাসি আমার কপালে চুমু খেল।

আমার জ্ঞান হওয়ার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘরে ঢুকেই বাড়িউলি দিদিমা কান্না জুড়ে দিল—আরেকটু হলেই সে কি সব্বনাশ হয়ে যেত দাদুভাই··· ··

ডলিমাসি ধমক দিল—তোমার কি আক্কেল-বুদ্ধি হবে না মাসি ··

বাড়িউলি দিদিমা চোখ মুছে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল—দাদুভাই, আর কখনো অমন করো না।

আমি সান্ত্বনা দিলাম—না, আর করব না।

দু'দিন অজ্ঞান হয়ে থাকার পর নাকি আমার জ্ঞান ফিরেছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে বেশিদূর যেতে পারিনি। জনকয় লোক আমাকে রাস্তা থেকে তুলে রোয়াকে শুইয়ে মাথা ধুইয়ে হাওয়া করে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছিল। একতলার দুষ্টু ছেলেটার ইস্কুলে যাওয়া-আসার রাস্তা ওটা। ও ফিরছিল ইস্কুল থেকে। ব্যাপার দেখে ও ছুটে এসে খবর দেয় বাড়িতে। বাসায় নিয়ে আসা হয় আমাকে। বাড়িউলি দিদিমা নিজে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনে। ডাক্তার একবেলা অপেক্ষা করে ডেকে আনে বড় ডাক্তারকে। মা খবর পাঠান ডলিমাসিকে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে ডলি-মাসি। এত কাণ্ড! দু'দিন পরে জ্ঞান ফেরে আমার।

অসুখটা যে আমার ভালো নয় ডাক্তারের হাবভাব দেখে সেই ধারণাটা আমার পাকা হল। ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছি, মনে হয় উঠতে গেলেই পড়ে যাব।

সেই থেকে দু'মাস শুয়েছিলাম বিছানায়। ভালো ভালো ফল ডিম দুধ মাছ মাংস আমাকে খেতে দেয়া হত। রোজ ইনজেকশন, দামী দামী ওষুধ। মা ঘন ঘন ট্রাঙ্ক খুলে চেন-লাগানো চামড়ার ব্যাগ থেকে টাকা বের করতেন। ঐ ব্যাগটায় আমাদের টাকা-পয়সা থাকত। মা একেকদিন সব জমানো টাকা গুনে দেখতেন, দেখে মনমরা হয়ে যেতেন। পেটমোটা ব্যাগটা অনেক রোগা হয়ে গিয়েছিল।

বড় ডাক্তারবাবু আরো দু'দিন এসেছিলেন। শেষের দিন খুব ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন—ভালো আছে। এই ইনজেক-শনটাই চলবে।

মা আমার হাতে অনেকগুলো টাকা দিয়ে বড় ডাক্তারবাবু ওঠবার সময় তাঁর হাতে দিতে শিখিয়ে রেখেছিলেন, আমি তা-ই করলাম।

উনি এমন আনমনাভাবে টাকাগুলো পকেটে রাখলেন যেন ওগুলো অদরকারী কাগজ। আমার মনে হল উনি মিথ্যে কথা বলেছেন, আসলে আমার অসুখটা খুবই খারাপ।

ডাক্তারের কথায় ভরসা পেয়ে ডলিমাসি ইস্কুলে জয়েন করল। কিন্তু রোজ সন্ধ্যেয় ও আসত। খাবার নয়তো ছবির বই হাতে থাকতই। ডলিমাসিকে আমার এত ভালো লেগে গিয়েছিল যে একদিন ও না এলেই আমার বড্ড খারাপ লাগত, পরের দিন এলে রাগ করে কথা বলতাম না। তখন ওকে আমার রাগ ভাঙাতে হত।

বাড়িউলি দিদিমা সব সময় মাকে সাহায্য করত, মা কাজে ব্যস্ত থাকলে আমার কাছে এসে বসে থাকত। ওর ছেলেদের তিন বছর করে জেল হয়ে গিয়েছিল। ওকে আর ছেলেদের কথা বলতে বা ওদের গালাগাল করতে শুনতাম না।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা'র সঙ্গে বাড়িউলি দিদিমার কথা হচ্ছিল :

—ভাড়াটা নিন।

—খোকনের চিকিচ্ছেয় তো অনেক টাকা লাগছে, ভাড়া পরে দিও।

—সে কি কথা, আপনারও তো দরকার।

—বলি হাঁ গা মেয়ে, ভাড়াটে কি আমার তুমি একলা, বলি আমি কি জলে পড়েছি।

বুড়ি কিছুতেই ভাড়া নেয়নি।

মা, ডলিমাসি, বাড়িউলি দিদিমা আমাকে ভালো করে তোলার জন্য কি-ই না করছিল। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে আমি বাঁচব না।

মা ইস্কুলে যাচ্ছিলেন না। ছুটি নিয়েছিলেন। নতুন চাকরি, হয়তো থাকবে না। মা'র দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। ডলিমাসি অবশ্য বলেছিল আমি ভালো হয়ে উঠলে মাকে ওদের ইস্কুলে চাকরি

করে দেবে। আমরা ডলিমাসির হস্টেলের কাছে বাসা নিয়ে থাকব।

বহু জল্পনা-কল্পনা হত আমাদের ভবিষ্যত নিয়ে। মা, ডলিমাসি আর বাড়িউলি দিদিমা এই তিনজনে। আমার কাছে বসেই এইসব আলোচনা হত, কিন্তু আমি কোনো আগ্রহ বোধ করতাম না। ডলিমাসি হয়তো হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করত—বেশ হবে তাহলে, না খোকন? আমি হয়তো শুনছিলামই না, কি ব্যাপার না জেনেই 'হ্যাঁ, বেশ হবে' বলে নিজের ভাবনায় ডুবে যেতাম। নানান ভাবনা হত আমার। বিশেষ করে মাকে নিয়ে। আমি মরে গেলে মা'র কি হবে, মা কার কাছে থাকবে। তবে ডলিমাসি নিশ্চয় মা'র যাতে ভালো হয় তা করবে—এই বিশ্বাসটুকু আমার ছিল। নিজেকে নিয়ে আমি মোটেই চিন্তিত ছিলাম না। বাবা মারা যাবার পর কে একজন আমাকে বলেছিল, বাবাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু উনি আছেন, আমাদের দেখছেন। কথাটা খুব যে আমার বিশ্বাস হয়েছিল তা নয়, কিন্তু ভাবতে ভালো লেগে-ছিল। এখন কথাটা আমার বারবার মনে হত। সারাক্ষণ বাবার কথা আমি ভাবতাম। মরে আমি তাঁর কাছে যাব, তাঁর সঙ্গে থাকব। আমার এসব চিন্তাভাবনা কিন্তু কাউকে আমি বলিনি।

আমার অনেকগুলি এক্সরে ছবি তোলানো হয়েছিল। ছোট ডাক্তার আরো মাসখানেক পরে একখানা ছবি হাতে হাসতে হাসতে আমাদের ঘরে এল।

—নিন, একদম সেরে গেছে। ডক্টর ঘোষকে প্লেটটা দেখিয়ে এনেছি। উনি এবার লং চেঞ্জ অ্যাডভাইস করেছেন।

ডাক্তারদের কথা মা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন।

ডলিমাসি আসতেই মা কথাটা পাড়লেন। —কোনো ভালো জায়গায় কিছুদিন গিয়ে থাকতে হবে। তোর জানাশোনা কেউ কোথাও আছে?

—তা নেই। তবে আমাদের ইস্কুলের দারোয়ান একবার বলেছিল পশ্চিমের দিকে কোথায় ওর বাড়ি। জল হাওয়া খুব ভালো। স্বাস্থ্য ফেরাতে যায় অনেকে। ওকে বললে ওখানে ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

—তাহলে তা-ই কর্।

—একা যাবি নাকি?

—আর কাকে পাব বল্।

—কেন, আমি কি মরেছি।

—তোকে আর কত কষ্ট দেব!

—সংসার করা তো হল না, পরের ওপর দিয়ে সংসারের কষ্টটা একটু চেখে নেই। হেসে বলল ডলিমাসি।

—আর সুখ?

—তাও যদি হয় মন্দ কি

একটু সময় চুপচাপ দু'জনেই. তারপর মা বললেন—আমার তো জানাশোনা কেউ নেই, বিক্রি করিয়ে টাকা জোগাড় করিস।

মা ডলিমাসিকে কয়েকটা গয়না দিলেন দেখলাম।

ডলিমাসি খানিকক্ষণ গয়নাগুলোর দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে শেষে বলল—ঠিক আছে, তা-ই করব। উপায়ই বা কি।

আমরা বেড়াতে যাচ্ছি শুনে বাড়িউলি দিদিমা এসে বলল—আমাকেও নিয়ে চল ডলি।

—তুমি কোথায় যাবে?

—ভয় নেই লো, টাকা আমি দেব।

—ছি, ছি, টাকার কথা বলেছি তোমাকে!

—এই ভূতের বাড়ি আগলাতে আমার আর ভালো লাগে না উষা।

আমি বললাম—মা, দিদিমা আমাদের সঙ্গে যাবে।

॥ পাঁচ ॥

ডলিমাসির ইস্কুলের দারোয়ান চিঠি লিখে দিয়েছিল। তার ভাই পথণ্ডু এসেছিল স্টেশনে। লম্বা-চওড়া চেহারা পথণ্ডুর। ইয়া গোঁপ। চুল ছোট করে ছাঁটা। পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা জুতো। হাসিটি লেগেই আছে মুখে। ঐ গোঁপ না থাকলে ওকে ভারি ছেলেমানুষ দেখাত ওর হাসির জন্যে।

পথণ্ডু আমাদের ঠিক চিনেছিল। বলল—হাপনারা কলকাতা ঠেকে আসছেন? উতোরপাড়ার ইস্কুলে হামার দাদা ছোটেলাল···

—তুমিই ছোটেলালের ভাই! ডলিমাসি বলল।

—জী হাঁ, হামার নাম পথণ্ডু।

নামটা শুনে আমার খুব হাসি পেয়েছিল। হেসেই ফেলতাম হয়তো, ঠিক তখনই পাহাড়টা চোখে পড়েছিল তাই রক্ষে।

স্টেশনের ঠিক পেছনেই, মনে হয় খুবই কাছে, একটা ছোট পাহাড়। এত কাছে যে গাছগুলিকে পর্যন্ত আলাদা আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল। পাহাড়ের গায়ে যে ছাগলগুলি চরছিল তাদেরও বুঝি এক এক করে গোনা যায়।

আমার বুকের ভেতরটা আনন্দ আর দুঃখে মেশানো অদ্ভুত একটা ব্যথায় টনটন করে উঠল।

—মা, পাহাড়···

এ দু'টি শব্দের মধ্য দিয়ে আমি যে কত কথা বলতে চেয়েছিলাম···। কিন্তু সবাই ব্যস্ত মালপত্র নিয়ে। মা শুধু বললেন—হ্যাঁ।

মালপত্র টাঙ্গায় তুলে দিল পথণ্ডু। সামনে বসলাম আমি আর ডলিমাসি। পেছনের আসনে মা আর দিদিমা। পাদানিতে দাঁড়িয়ে গেল পথণ্ডু। টাঙ্গা চলল টগবগিয়ে। ডলিমাসি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল—কেমন লাগছে খোকন?

—ভালো। আমি বললাম।

—চোখ জুড়িয়ে যায় রে উষা। জন্মে ইস্তক খাঁচায় বন্দী। ভাগ্যিস তোদের সঙ্গে আসার কথা মনে হয়েছিল, নইলে এমন সুন্দর দেশটা দেখা হত না। বাড়িউলি দিদিমা জায়গাটার তারিফ করছিল।

ট্রেনে সারাটা রাস্তা দিদিমা জানলার ধারে বসে এসেছে। বুড়ো বয়সে দেশ বেড়ানোর আনন্দ সবাইকে ছাপিয়ে গেছে।

পখণ্ডু বলল—হাঁ, বহুৎ আচ্ছা জাগা আছে মা। সব হামি হাপনাদের দেখলায়ে দিব। কাজ কাম ভি যো কুছ দরকার হোবে হামাকে ডাকবেন। উঠানমে যো কামরাঠো দেখবেন উখানে হামি থাকি।

—তুমি তো চমৎকার বাংলা বল পখণ্ডু। ডলিমাসি ঠাট্টা করেই বলল হয়তো।

পখণ্ডু কিন্তু খুব খুশি হয়ে বলল—জী, থোড়া থোড়া বাংলা বোলি হামি বলতে পারি। হামার মনিব বঙ্গালী আছেন।

—তোমার মনিব এখানে থাকেন?

—নহি, উনি সালমে একবার বেড়াতে আসেন। এক মাহিনাকা অন্দর আসিয়ে যাবেন, এক-দো মাহিনা থাকবেন, ফিন চলিয়ে যাবেন। হামি মোকানের দেখাশুনা করি, একতল্লাকা ভাড়া উঠাই, ইসি টাইমমে বহুৎ চেঞ্জর লোক ইধর আসে। দোতল্লা বাবুর খুদ লিয়ে রাখা আছে। মোকানকে সামনে থোড়া খেতি আছে, উসকা দেখভাল ভি হামি করি।

দেখতে দেখতে একটা ছবির মতো বাড়ির সামনে আমাদের টাঙ্গা দাঁড়িয়ে গেল। টাঙ্গা থেকে নেমে আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বাড়িটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকলাম। যেন আমরা কেউ বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে এই আশ্চর্য বাড়িটায় আমরা থাকব। ধপধপে সাদা রংয়ের ছিমছাম দোতলা বাড়ি। দরজা জানলায় নতুন সবুজ রং। দু'সার নাম না জানা লতা উঠে গেছে দেয়াল বেয়ে।

ফুল ধরেছে লতায়। দোতলার বারান্দায় চীনেমাটির অনেকগুলি বাহারে টব ঝোলানো। একপাশে ছাদে ওঠার ঘোরানো সিঁড়ি। বাড়ির সামনে অনেকটা জায়গা—বাগান আর খেত। এক-বাগান বড় বড় সূর্যমুখী আকাশ পানে তাকিয়ে আছে। খেতে লকলকে নধর পালং। অল্প দূরে নদী, নদীর বাঁকের মুখে বাড়িটা, মনে হয় আদরের একখানা হাত যেন বাড়িটাকে বেড় দিয়ে আছে। রোদ্দুরে ঝকঝক করছে নদীর জল। ওপারে গ্রাম, গ্রামের কুটির, বন, বনের বিস্তার, আর পরের পর পাহাড় অনেক দূরে আকাশের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

—আসেন আসেন। মালপত্র তুলে দিয়ে পখণ্ডু আমাদের ডাকল।

কাজের লোক পখণ্ডু। ঘরদোর পরিষ্কার করে, কুয়ো থেকে জল তুলিয়ে সব ব্যবস্থা সে করে রেখেছিল। নদীর দিকের ঘরখানায় আমি আর মা থাকব ঠিক হল। অন্যখানায় ডলিমাসি আর দিদিমা। ট্রেন জার্নি করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়লাম।

খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙল। তখনো অন্ধকার-অন্ধকার। নদী পেরিয়ে, গ্রাম পেরিয়ে, বন পেরিয়ে, পাহাড় পেরিযে অনেক দূরে আকাশের খানিকটা জায়গায় চাপা আলো। ওখানে পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে সূর্য উঠবে। যখন আমরা চা-বাগিচায় ছিলাম বাবা অনেকবার আমাকে ঘুম থেকে তুলে এ দৃশ্য দেখিয়েছিলেন। আমি স্থির হয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু ভেতরটা আমার উত্তেজনায় কাঁপছিল। আলোটা বাড়তে লাগল, তারপর হঠাৎ যেন এক লাফে পাহাড়ের মাথা টপকে সূর্য উঠে পড়ল আকাশে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘরের ভেতরটা সোনালী আলোয় ভরে গেল।

পিঠে হাতের ছোঁয়া লাগতে পেছনে তাকিয়ে দেখি মা কখন এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখাচুখি হতে মা হাসলেন, আমার গরম জামার

বোতাম ভালো করে এঁটে জানলা খুলে দিয়ে চলে গেলেন।

চড়ুই পাখিরা ঘরে ঢুকে কিচিরমিচির করতে লাগল। কি চঞ্চল ওরা, একটা মুহূর্ত স্থির থাকছে না। উঠোনে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, উড়ে চলে আসছে ঘরের ভেতরে, মারামারি করছে, ওদের ব্যস্ততার যেন শেষ নেই। একটা চড়ুইকে আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করলাম, সেটা সবার চাইতে দুষ্টু, কেবল কেড়ে খাওয়ার তাল, মারামারিতেও সবার চাইতে ওস্তাদ। ওর কাণ্ড দেখে আমার খুব মজা লাগছিল।

ঝকঝকে পেতলের কলসি মাথায় গয়লানী দুধ নিয়ে এল। হাতে পায়ে মোটা মোটা রুপোর গয়না। গোলমতো মুখখানা, হাসি-হাসি।

—এ মায়ি, দুধ লেব ?

দিদিমা বেরিয়ে এল, ডলিমাসি তার পেছনে।

গয়লানীর সঙ্গে দিদিমা আর ডলিমাসি এমন বিদ্‌ঘুটে হিন্দী কথা শুরু করে দিল যে আমার ভীষণ হাসি পেতে লাগল। পখণ্ডু এসে দাম টাম ঠিক করে দিল।

যাবার সময় গয়লানী আমার জানলার নিচে দাঁড়াল—এ খোঁখা হামার ঘর আসবিন ?

আমি মাথা নাড়লাম।

—আচ্ছা ! হামার বিটিকা সাথ শাদি বইঠব ?

—এই, এ কি বলছে ? আমি পখণ্ডুকে শুধোলাম।

—বোলছে ইসকা লড়কিকে তুমি বিহা করবেন ? পখণ্ডু গোঁপ চুমরে বলল।

—যাঃ। আমি ভীষণ লজ্জা পেলাম।

গয়লানীর হাসিটা যেন ওর চকচকে কলসিতে রোদ্দুর পড়ার মতোই ঝিকিয়ে উঠল। আমার ভারি ভালো লাগল। হাসতে হাসতে চলে গেল ও।

রাস্তা দিয়ে এক্কা চলেছে। ঘোড়ার নাল-পরানো পায়ের টকাটক টকাটক শব্দ এতদূর থেকেও শুনতে পাচ্ছি। আমার বুকের মধ্যে একটা তালের বাজনার মতো শব্দটা বেজে চলেছে। একটা টিলার আড়ালে এক্কাটা হারিয়ে গেল। আমি টিলার ওপরে তাকালাম। আমারই মতো দু'টি ছোট ছেলে অল্প কুয়াশায় মেশা-মিশি মলমলের মতো রোদ্দুরে ওখানে ছোটাছুটি করছে। মনে হল ওরা যেন আলোয় নাইছে। আমিও যদি অমন করে নাইতে পারতাম!

ডলিমাসি যখন আমাকে জলখাবার খেতে ডাকতে এল তার আগেই আমার মনে হতে শুরু করেছে যে আমি না-ও মরে যেতে পারি। ডলিমাসিকে বললাম—খুব খিদে পেয়েছে, অনেকগুলো খাব কিন্তু।

॥ ছয় ॥

পনেরো দিনেই আমার শরীর অনেক ভালো হয়ে গেল।

তখনো অবশ্য বাড়ির কম্পাউণ্ডের বাইরে বেরুনোর হুকুম মেলেনি। সকালে রোদ ওঠবার পর ঘণ্টা খানেক আর বিকেলে সূর্য ডোববার আগে পর্যন্ত কিছুক্ষণ আমি মা কিংবা পথগুর সঙ্গে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঘুরে বেড়াতাম। আমার বেরুনো বারণ বলে মাও বেরুতেন না। ডলিমাসি আর দিদিমা খুব বেড়াত। আমার দারুণ হিংসে হত।

মা কোলকাতার ডাক্তারবাবুকে বড় বড় চিঠি লিখে সব জানাতেন। ডাক্তার যেমন যেমন লিখত ঠিক সেইভাবে আমার খাওয়া-দাওয়া চলাফেরা সব চলত, একটুও হেরফের হওয়ার উপায় ছিল না। বেশির ভাগ সময় দিদিমা আমার কাছে থাকত। সঙ্গী হিসেবে দিদিমাকে আমার ভালোও লাগত খুব। কারণ দিদিমার

মতো শ্রোতা পাওয়া ভার। কোনো ওজর-আপত্তি না করে, ডলিমাসির মতো মাঝে মাঝে ঠাট্টা না করে সব কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে যেত। ডলিমাসিও ভালো, তবে ওর বড্ড আদর করা স্বভাব আর কথায় কথায় ইয়ার্কি করে। যদিও বেশি কথা বললেই মা আমাকে ধমক দিতেন, তবু মাকেই অবশ্য আমি সবচেয়ে বেশি কাছে চাইতাম। কেন তা বলে বোঝানো যায় না। মা'র সঙ্গে কোথায় যেন আমার ভীষণ মিল ছিল। যদিও আমি যেমন বাবার কথা বলতে পেলে আর কিছু চাইতাম না মা ঠিক তেমন ছিলেন না, খুব কমই বলতেন বাবার কথা। বাবার ছবিটা কিন্তু এখানে আনতে মা ভোলেননি, প্রথম দিনই ঘর সাজানোর সময় আমাদের ঘরে ছবিটা টাঙিয়ে দিয়েছিলেন।

দিদিমাকে আর চেনাই যাচ্ছিল না। এ আর আতুড়-গায়ে নোংরা খাট থানপরা ঝুটি-বাঁধা কোলকাতার দিদিমা নয়। ফর্সা জামা-কাপড়ে তাকে বেশ সুন্দর আর ভালোমানুষ দেখায়। কোলকাতায় যেমন তাকে দেখলেই ঝগড়াটি বলে মনে হত, তেমন না। দিনরাত খিচমিচ করা, ছেলেদের গালমন্দ করা, সেসব যেন ভুলেই গিয়েছিল দিদিমা।

ডলিমাসি মাকে আর দিদিমাকে ঘরের কোনো কাজ করতে দিত না। মাকে বলত – যা, ছেলে দেখ্‌গে যা। দিদিমাকে বলত — সারা জীবন তো ভূতের বেগার খাটলে, ক'টা দিন জিরোও না। মা তাই সারাদিন আমার এটা-সেটা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। আর দিদিমা জানলার ধারে একটা চেয়ারে বসে সারাক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকত বাইরের দিকে। দিদিমা কি ভাবছে আমি আন্দাজ করতে চেষ্টা করতাম। কখনো মনে হত দিদিমা তার ছেলেদের কথা ভাবছে। আবার মনে হত বুড়ি হয়তো আমার মতোই পাহাড় বন নদীকে ভালোবেসে ফেলেছে। দিদিমার জন্যে ভারি মায়া হত আমার। আর ডলিমাসির মতো পরের দুঃখকষ্ট কেউ বুঝত না।

সবার সুখ-সুবিধের দিকে সব সময় নজর। নিজের কষ্ট ও গায়েই মাখত না। অন্যের সুবিধে করে দিতে পারলেই ও যেন আনন্দ পেত।

একটু একটু করে ডলিমাসি আর দিদিমা আমার বড় আপন হয়ে উঠেছিল। মনে মনে আমি একরকম ঠিকই করে ফেলেছিলাম যে বড় হয়ে যেখানেই থাকি না কেন ডলিমাসি আর দিদিমাকে আমাদের কাছেই নিয়ে যাব। দারোয়ান হিসেবে পথগুকেও আমার খুব পছন্দ হয়েছিল।

মরে যাবার কথা আর আমার মনে হত না, বরং বড় হয়ে বাবার মতো হওয়ার চিন্তাটাই রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

পথগু একখানা টেলিগ্রাম হাতে মাকে এসে বলল—দিদিমণি, পঢ়িয়ে দেন।

মা পড়ে বললেন—কাল তোমার বাবু আসছেন।

পথগু ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। তার দু'জন দেশোয়ালী ভাইকে নিয়ে এসে দোতলাটা সাফসুফ করে ফেলল। সারা দুপুর খেটে বাগান-টাগান সব পরিষ্কার ছিমছাম করে তুলল।

বিকেলে ডলিমাসি আর দিদিমা বেড়াতে গেল নদীর দিকে। আমি মা'র সঙ্গে কম্পাউণ্ডে বেড়াচ্ছিলাম রোজকার মতো।

পথগুকে দেখা গেল ওর ঘরের সামনে বসে বাগানের যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করতে।

মা বললেন— তোমার বাবুকে তুমি বুঝি খুব ভয় কর পথগু!

—জী নহী, পথগু বলল একটা নিড়ানিতে শান দিতে দিতে, বাবু বিলকুল ঠাণ্ডা আদমি আছেন। সাফা কাম উনি পসন্দ্‌ করেন, উসি লিয়ে······

পরদিন সকালে ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরে পথগু স্টেশনে গেল।

সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। আমি শুধু বারবার জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে দেখছিলাম। অধৈর্য হয়ে মাকে একবার জিজ্ঞেস করলাম—কোলকাতার গাড়ি কখন আসবে? আসবে।—মা বললেন। পখণ্ডুর মনিব সম্পর্কে আমার কৌতূহলের কারণ ছিল। এমন চমৎকার যাঁর বাড়ি, তিনি মানুষটা কেমন? নিশ্চয় সুন্দর হবে তাঁকে দেখতে। কিন্তু যদি মোটা কালো বেঁটে কিংবা রোগা লম্বা যাচ্ছেতাই-ই হয়? কে কে আসবে তাঁর সঙ্গে?

ঝিকঝিক করে রেলগাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল, থামল, সিটি বাজল, আবার ঝিকঝিক করে চলে গেল। আমি জানালায় দাঁড়িয়ে খুব উত্তেজিতভাবে শব্দগুলি শুনলাম। ছুটে গিয়ে মাকে খবরটা দিয়ে এলাম। তারপর স্টেশনে যাবার রাস্তাটা যেখানে টিলার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেখানে আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল।

হঠাৎ ঐ বাঁকের মুখে একটা টাঙ্গা দেখা যেতেই আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। পখণ্ডুকে দূর থেকেও আমি স্পষ্ট চিনতে পারলাম। টাঙ্গা এসে গেটের সামনে থামল। পখণ্ডু লাফিয়ে নেমে পড়ল। সৌরেনবাবু পেছন দিকে বসেছিলেন। উনি নেমে বাগানে পখণ্ডুর ঘরের সামনে একটু দাঁড়ালেন, চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। পখণ্ডুকে ডেকে কি যেন বলে আস্তে আস্তে দোতলায় উঠে গেলেন। উনি একা। সঙ্গে কেউ আসেনি। বেশ দেখতে ওঁকে। লম্বা সুন্দর চেহারা, চোখে পুরু চশমা। মুখখানা গম্ভীর, কিন্তু দেখলে ভয় করে না।

সৌরেনবাবু খুব চুপচাপ মানুষ। বাড়িতে যে আছেন বোঝাই যেত না। সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখতাম উনি বেড়িয়ে ফিরছেন। বিকেলে বেরুতেন কোনো কোনো দিন। ফিরতেন রাত করে, আমরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছি। পখণ্ডু ওঁর রান্নাবান্না থেকে সব কাজ করে দিত। উনি শুধু বই পড়েন। পখণ্ডু বলেছিল।

সৌরেনবাবুর সঙ্গে আমাদের মধ্যে প্রথম আলাপ হল আমার।

একদিন উঠোনে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কি?

নাম বললাম আমি।

উনি বললেন—ওপরে এসো।

দোতলাটা ঘুরে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দোতলা থেকে নদীটা আরো সুন্দর দেখায়, স্টেশনের রাস্তাটাও অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ওঁর ঘরগুলো সুন্দর সাজানো। আলমারিভর্তি বই। বারান্দায় ঝোলানো টবে মজার মজার কাঁটাগাছ।

সব দেখে আমি সুচিন্তিত মন্তব্য করলাম—দোতলাটা একতলার চেয়ে অনেক ভালো।

সৌরেনবাবু হেসে বললেন—বেশ তো, তুমি আমার কাছে থাকবে।

মা পাশে না থাকলে যে আমার ঘুম হয় না সে কথা কি কাউকে বলা যায়। তাই কোনো উত্তর দিলাম না।

উনি পথগুকে ডেকে আমার জন্যে ডিম দুধ বিস্কুট দিতে বললেন।

খেয়ে-দেয়ে টেবিলের ওপর যেসব বই ছিল তা থেকে একখানা নিয়ে ছবি দেখতে লাগলাম, উনি আমাকে ছবিগুলি চিনিয়ে দিলেন।

ছবি-টবি দেখে আমি বললাম—আমি নিচে যাই?

—যাবে? উনি বললেন, আচ্ছা চল, তোমার মাকে বলে আসি, এ বেলা তুমি আমার সঙ্গে খাবে।

সৌরেনবাবু বাইরে দাঁড়ালেন। আমি মাকে ডেকে আনলাম। ডলিমাসিও এল। মা সৌরেমবাবুকে ঘরে আসতে বললেন। চেয়ার দিলেন বসতে।

দু'একটা কথার পর সৌরেনবাবু বললেন—খোকন এ বেলা আমার সঙ্গে খাবে। আপনার অনুমতি নিতে এলাম।

—কিন্তু ওর যে অসুখ। মা ইতস্তত করে বললেন।

—কি অসুখ? খাওয়া-দাওয়ার কোনো……

মা চোখে অস্বস্তি নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। —না, তা নয়। তবে সব শুনলে আপনারই হয়তো…… খোকন, তুমি ও ঘরে যাও তো একটু।

বুঝলাম মা আমার সামনে অসুখের কথা বলতে চাইছেন না। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। খানিক পরে ডলিমাসির ডাক শুনলাম—খোকন, খোকন।

গিয়ে দেখি সবাই বেশ হাসিখুশি।

সৌরেনবাবু বললেন—খোকন, অনুমতি পাওয়া গেছে, চল।

—আমরা যেন বাদ না পড়ি এরপর। ডলিমাসি এরই মধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়েছে।

—বাদ পড়বেন কেন, সৌরেনবাবু উঠে আমার হাত ধরে বললেন, তবে রান্নার দায়িত্ব কিন্তু আপনাকে নিতে হবে। পথগুরুর রান্না আপনারা মুখে তুলতে পারবেন না।

—তা-ই নেব। নেমন্তন্ন ছাড়তে আমি রাজী নই। বেশি বেশি হেসে ডলিমাসি বলল।

সৌরেনবাবু আমাকে কোলে তুলে নিলেন। কোলে উঠে আমার ভারি লজ্জা করছিল। বড় হয়েছি তো! দোতলায় উঠে উনি আমাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে তবে যেন স্বস্তি পেলাম।

—খোকন, তুমি খুব ভালো ছেলে, সৌরেনবাবু আমাকে আদর করতে করতে বললেন, তোমার মা তোমাকে ছাড়তেই চাইছিলেন না, আমি জোর করে নিয়ে এলাম। ভালো করিনি?

—আমার অসুখ কিনা। আমি খুব বিজ্ঞের মতো বললাম।

—না, তোমার কোনো অসুখ নেই, তুমি একদম ভালো হয়ে গেছ। বলে উনি আমার মাথার চুল এলোমেলো করে দিলেন।

খুব ভাব হয়ে গেল আমাদের। ওঁর ঘরে রাশি রাশি বই আর

কাচের আলমারিতে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস। সেসব নিয়ে আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলাম, উনি একটুও বিরক্ত না হয়ে উত্তর দিয়ে যেতে থাকলেন।

ওঁর শোবার ঘরের দেয়ালে মস্ত বড একটা ফটো ছিল—একজন মহিলার। তাঁর মুখখানা ভারি নরম, ভারি সুন্দর। ছবিটা বারবার দেখলাম। মনে হল মুখের ভাবটা যেন আমার খুব চেনা, কিন্তু ভেবে পেলাম না কোথায় এঁকে দেখেছি। পরে অবশ্য জেনেছিলাম তাঁকে আমি কোনোদিনই দেখিনি। তবু যে কেন তাঁকে আমার এত চেনা মনে হয়েছিল······

—ইনি কে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—আমার বৌ।

বৌ কথাটার সঙ্গেই লজ্জার একটা সম্পর্ক আছে! তাই ছবিটা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও চুপ করে যেতে হল।

দুপুরটা সৌরেনবাবুর সঙ্গে কাটিয়ে আমার মনের জানলাগুলি, যেগুলি বাবার মৃত্যুতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার যেন একে একে খুলে যেতে লাগল। ওঁর পাশে শুয়ে গল্প করতে করতে আমার কল্পনার চৌঘুড়ি আবার ছুটল নানান অজানা দেশে। বাবার গল্পে থাকত পাহাড় জঙ্গল জন্তু-জানোয়ার, সৌরেনবাবুর গল্পে আজব সব দেশ আর নানান মানুষের কথা। দুপুরটা যে কোথা দিযে কেটে গেল টেরই পেলাম না।

বিকেলে আমাদের ঘরে আমাকে দিয়ে যেতে এসে সৌরেন-বাবুকে চা খেয়ে যেতে হল।

ডলিমাসি এমন বকবক করছিল যেন কতকাল কথা বলেনি। মা দু'একটা কথা বলছিলেন। দিদিমা সেকেলে বুড়িদের মতো লজ্জায় বাইরেই আসেনি

চা খেতে খেতে পরদিন সকলে মিলে চণ্ডীপাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন সৌরেনবাবু।

মা বললেন—আপনি ডলি আর মাসিমা যাবেন। আমি আর খোকন বাড়িতে থাকব।

—আপনি যাবেন, খোকনও যাবে। এখান থেকে স্টেশন পর্যন্ত টাঙ্গায়, তারপর হাঁটাপথ, পথশু না হয় আমার কাঁধে চেপে খোকন ঐটুকু যেতে পারবে। কোনো কষ্ট হবে না।

মা তবু আপত্তি করলেন—কিন্তু ···

— আপনি ভয় পাবেন না, একটু-আধটু বাইরে বেরুনো ওর খুব দরকার। বিশ্বাস করুন···সত্যিই দরকার।

মা আর আপত্তি করতে পারলেন না।

সৌরেনবাবুর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি রইল না। বাংলোর কম্পাউণ্ডের বাইরের জগৎটা যে আমাকে কতখানি আকুল করে তা উনি কত সহজে বুঝতে পেরেছেন। অথচ কাছের মানুষেরা তা জানতে চায় নি, জানার চেষ্টাও করেনি।

চণ্ডীপাহাড়ে ঝরনা। ঝরনা শুকিয়ে গেছে এখন। শুধু সরু একটা জলের ধারা তিরতির করে এঁকে-বেঁকে ছোটবড় নুড়ির তলা থেকে উঁকিঝুঁকি দিতে দিতে বয়ে চলেছে। ঝরনার বুকে জায়গায় জায়গায় জল জমে ছোট ছোট ডোবার মতো হয়ে আছে। এগুলিকে নাকি কুণ্ড বলে। ঝরনার ঐ সরু ধারাটা কখনো শুকিয়ে যায় না, আর কুণ্ডগুলিও তাই কখনো শুকোয় না।—পথশু বলছিল। আমরা ঝরনার পাশ দিয়ে চণ্ডীবাড়ির দিকে এগোচ্ছিলাম। আমি পথশুর কাঁধে। আমাদের পেছনে মা আর দিদিমা। দিদিমা মা'র হাত ধরে আস্তে আস্তে হাঁটছে। ডলিমাসি সৌরেনবাবুর সঙ্গে অনেকটা এগিয়ে গেছে। ফাঁকা জায়গা বলে ডলিমাসির হাসির শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

পেছন থেকে দিদিমার গলা কানে এল—ডলিটার বয়স বাড়ছে না কমছে! কি রকম হ্যা হ্যা করে হাসছে দেখছিস উষা?

বুড়িদের অনেক কিছুই অদ্ভুত। কেউ মনের খুশিতে হাসলে তার জন্যে আবার কারুর রাগ হয় নাকি? কেউ হাসলে, যেমন ডলিমাসি হাসছে, আমার তো খুব ভালো লাগে।

মা বললেন—হাসুক না একটু, ক্ষতি কি।

—তোর যেমন কথা · ·। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে দিদিমা আর বলতে পারল না।

তাকিয়ে দেখি মা দিদিমাকে সামলে নিয়েছেন, কিন্তু ওর মুখের চেহারা দেখে হাসি পেল আমার।

খুব ইচ্ছে করছিল কাঁধ থেকে নেমে পাথর টপকে টপকে ছুটতে। কিন্তু সে অনুমতি পাব না জানা কথাই, তাই চুপ করে রইলাম। ঝরনার বুকটা বেশ চওড়া, বড় বড় পাথর আর নুড়িতে ভর্তি। আমাদের ডান দিকে ঝরনা, বাঁ দিকে বনতুলসী বুনো কুল আর ছোট ছোট গাছের জঙ্গল। মিষ্টি বুনো গন্ধ পাচ্ছিলাম একটা। ঝরনার ওদিকে পাহাড়টা আচমকা দেয়ালের মতো খাড়া হয়ে উঠে গেছে ওপর দিকে, গাছগুলি যেন ঝাঁকড়া চুলওলা মানুষের মতো বারান্দা থেকে বাইরের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে আছে।

পথগু জোরে হাঁটছিল। আমরা সৌরেনবাবুর কাছাকাছি চলে এসেছিলাম। উনি পেছন ফিরে একটু হেসে দাঁড়িয়ে পড়লেন, আমরা ওর পাশাপাশি যেতে আবার হাঁটতে শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে বললেন—খোকন, এই ঝরনাটা বর্ষাকালে কেমন হয় বল তো?

—কেমন?

—জল এই রাস্তা অবধি উঠে আসে, আর সে কি জোর জলের। বড় বড় পাথরগুলোকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায়। গুমগুম করে শব্দ হয়। প্রত্যেক বছর পাহাড়ের এখান-ওখান থেকে খানিক খানিক ধ্বসে পড়ে। যেমন ভয়ের, তেমনি সুন্দর······

আমাকে বলতে বলতে যেন সৌরেনবাবু নিজের সঙ্গেই কথা বলতে শুরু করলেন, নিজের মধ্যেই তলিয়ে যেতে লাগলেন।

এমনি করে আরেকজনকে আমি নিজের মধ্যে তলিয়ে যেতে দেখেছিলাম। কিন্তু কবে? কোথায়? মনে করতে পারলাম না। অথবা মনে করার প্রশ্নটাই হয়তো তখন আমার শিশুমনে জাগেনি। শুধু এই ভালোবাসা, ভালোবেসে তন্ময় হয়ে যাওয়া আমার খুবই পরিচিত মনে হয়েছিল। কলি মনে না পড়লেও অনেক পুরনো কোনো ভালো-লাগা গানের সুব যেমন মনকে ছুঁয়ে যায়।

সৌরেনবাবুর কথা শুনতে শুনতে আমি ঝরনার খেপা মূর্তিটা কল্পনা কবতে চেষ্টা করছিলাম। মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ ডলিমাসি বলল—সত্যি আপনারা ভাগ্যবান···।

বলে ডলিমাসি আরো যা যা বলল সেগুলো আমার কেমন বানানো কথার মতো মনে হল। ডলিমাসি তো এভাবে কখনো কথা বলে না।

চণ্ডীবাড়ি আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। ঝরনার ঠিক ওপরেই মন্দির। পূজারী বলল বর্ষাকালে ঝরনার জলে মন্দিরের উঠোন ডুবে যায়। পেছনে পাহারাদারেব মতো খাড়া পাহাড়। এতটা পথ আমরা চড়াই ভেঙে এসেছি। তারপর অনেক ধাপ পাথরকাটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছি ঝরনার ধারে। ঝরনার ওপবে পাকা ব্রীজ। ব্রীজের ওপারে মন্দির। তীর্থযাত্রীদের থাকবার পাকা বাড়ি। চণ্ডীপাহাড়ের সবত্র নির্জনতা। কিন্তু এখানটায় সেই নির্জনতা এমন স্নিগ্ধ শান্ত সুন্দর যেন ফিরে যেতে আর ইচ্ছে করে না। সারাটা পথ যে দিদিমা গজগজ করেছে সে পযন্ত পথের কষ্ট ভুলে এ কথাই বলছিল। আমি ভাবছিলাম বড় হয়ে মা ডলিমাসি আর দিদিমাকে নিয়ে যদি এখানে থাকা যায় তবে মন্দ হয় না। দেখাশোনা বাজার হাট করার জন্য থাকবে পখণ্ডু। মন্দিরের পেছনে আমাদের উঁচু বাড়িটা তৈরি হবার মতো খানিকটা জায়গাও যে আছে তাও আমি দেখে নিয়েছিলাম।

দিদিমার লজ্জা কেটেছে। সৌরেনবাবু ওকে তীর্থমাহাত্ম্য

শোনাচ্ছিলেন, দিদিমা ঘন ঘন কপালে হাত ঠেকাচ্ছিল। পখণ্ডু আমাকে নিয়ে মন্দিরের উঠোন থেকে ঝরনার বুকে নেমে-আসা সিঁড়িতে বসল। সামনে বেশ বড় একটা কুণ্ড। সেটা দেখিয়ে পখণ্ডু বলল— বাবাজী লোক এহি পানি খান। বহুৎ আচ্ছা পানি। খানেসে সব বিমার বিলকুল আরাম হোয়ে যায়।

—বাবাজী লোক কাদের বলে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—পূজা-উজা করেন। সাধু আদমি।

তীর্থযাত্রীদের বাড়ির ছাদে উঠেছেন মা আর ডলিমাসি। মাকে যে কি সুন্দর দেখাচ্ছে! ডলিমাসি হাত নাড়ল আমার দিকে চেয়ে।

মা ডলিমাসি দিদিমাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু ফেরবার পথে মনে হচ্ছিল আজকের মতো ভালো আমি ওদের আর কোনো-দিন বাসিনি। সৌরেনবাবু পখণ্ডু এরাও বেশ লোক। আমি পখণ্ডুর কাঁধে চেপে ওর মাথায় গালে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে এলাম।

পখণ্ডুর সুড়সুড়ি লাগছিল - এ খোঁখাবাবু, মৎ করেন, হামার হাঁসি লাগে।

॥ আট ॥

রোজ দুপুরে সৌরেনবাবুর সঙ্গে গল্প করা চাই-ই আমার। খাওয়া-দাওয়ার পর মা আমাকে পাঠিয়ে দেন ওপরে। একলাই যাই। একেকদিন ডলিমাসি সঙ্গে যায়। ডলিমাসির ভাব দেখে মনে হয় ওরও ইচ্ছে আমার সঙ্গে থেকে যায়, বসে বসে গল্প করে। কিন্তু সৌরেনবাবুর যেন তা ইচ্ছে নয়। এতে আমার অবশ্য সমর্থনই আছে, কারণ সৌরেনবাবু তাহলে পুরো মনোযোগটা আমার দিকেই দিতে পারেন। উনি ডলিমাসিকে চলে যেতে বলেন না, তা কি বলা যায়, কিন্তু না বলেও, আমি বেশ বুঝতে পারি, উনি কথাটা তাকে জানিয়ে দেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডলিমাসি চলে যায়।

আমরা পাশাপাশি শুয়ে রাজ্যের গল্প করে যাই। উনি আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। গল্প করতে করতে প্রায়ই আমার ঘুম এসে যায়। দু'একদিন উনিই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েন, আমার ঘুম আসে না, তখন শুয়ে শুয়ে আমি ওঁকে লক্ষ্য করি। কানের পাশে কিছু কিছু চুল পেকেছে। টিকলো নাক। ঘন ভুরু। ভারি মুখ। ঐ মুখের দিকে চেয়ে থাকলে যেন মনে আর কোনো ভয়ই থাকে না। অনেকক্ষণ ধরে ওঁকে দেখি। তারপর হয়তো পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে চেয়ারে বসে ছবিওলা বই দেখি। যেসব বইতে ছবি আছে সেগুলি উনি আমার জন্য টেবিলে নামিয়ে রেখেছেন। আমার যখন ইচ্ছে বইগুলি দেখতে পাবি, উনি বলে দিয়েছেন, কেননা আমি খুব শান্ত ছেলে, বই কিভাবে নাড়াচাড়া করতে হয় তা জানি বলে উনি আমার অনেক প্রশংসা করেন।

ওঁকে আমার সব কথা বলেছি। শুনে ডলিমাসির মতো উনি হাসেননি, বেশ ভেবে-চিন্তে সমস্যাগুলির সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন অথবা সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। কোলকাতার বাড়ি থেকে সেই পালানোর ব্যাপারটাও ওঁকে বলেছি। নিজে থেকেই এ কথা সেদিন পর্যন্ত কাউকে বলিনি, জিজ্ঞেস করেও কেউ উত্তর পায়নি আমার কাছ থেকে

শুনে সৌরেনবাবু বলেছেন—তোমার খুব একা লাগছিল তখন ?

—হ্যাঁ।

—একলা মনে হলে ভয় করে, তা-ই না ?

—তা-ই তো। তখন আপনি থাকলে আমার অমন ভয় করত না।

উনি আমাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। চুপ করে থেকেছেন অনেকটা সময়।

যেদিন আমি ঘুমিয়ে পড়ি, বিকেল হয়ে গেলে, বেশি দুধ দিয়ে কোকো তৈরি করে, ক্রিম-বিস্কুট প্লেটে সাজিয়ে উনি আমাকে ডেকে

তোলেন। খাওয়া হয়ে গেলে মুখ মুছিয়ে, চুল আঁচড়িয়ে আমাকে মা'র কাছে দিয়ে আসেন। আমার আদর পেতে কি যে ভালো লাগে!

সৌরেনবাবু যদি আমাদের আগে এখান থেকে চলে যান, আমি ভাবি, তাহলে এখানে থাকতে আমার ভীষণ কষ্ট হবে। ওঁকে কিছুতেই যেতে দেব না।

এদিকে ডলিমাসির ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি অবাক। কি সাজে আজকাল ডলিমাসি! বরাবর দেখছি ও টেনিস বলের মতো গোল একটা খোপা বাঁধে, কিন্তু ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছি রঙীন ফিতে জড়িয়ে ডবল বেণি বাঁধছে, বাগান থেকে ফুল তুলে বেণিতে পরে মাঝে মাঝে। সব সময় ফিটফাট। ট্রাঙ্ক খুলে শাড়ি বের করে পছন্দই করে উঠতে পারে না যেন। মজা লাগছিল আমার। বয়েস ডলিমাসির মা'র সমানই হবে। বাবা বেঁচে থাকতে মাও সাজতেন, দামী দামী জামা-কাপড় গয়না সবই পরতেন, কিন্তু কোথায় যেন একটু পার্থক্য ছিল। বোধ হয় ডলিমাসির মতো ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ হবার চেষ্টা করতেন না বলেই মাকে ভালো লাগত। আজকাল ডলিমাসি যখন আমাকে আদর করে শুধু সেন্টের গন্ধই পাই না, আদরের বাড়াবাড়ি আগের চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও ঠিক যেন আমার আপন হয়ে ওঠে না। ঠোঁট, গাল, হাত, নরম বুকের ছোঁয়ায় মায়ের মতন সেই ডলিমাসি ক্রমেই আমার অচেনা হয়ে যেতে থাকে।

ডলিমাসির সাজগোজ নিয়ে দিদিমা তাকে একটু-আধটু বকত। তার কথা গায়েই মাখত না ডলিমাসি, হেসে বলত—ছাত্রীদের সামনে তো সাজা যায় না, এখানে তাই সাধ মিটিয়ে নিচ্ছি।

মা হেসে বলতেন—সাধ বটে, তবে ···

—কি রে কি? ডলিমাসি উৎসাহে ঝলমল করে উঠত।

মা এড়িয়ে যেতে চাইলে ডলিমাসি হাত ধরে তাঁকে হিড়হিড় করে একদিকে টেনে নিয়ে যেত। তারপর তাঁদের কি কথাবার্তা হত কে জানে।

॥ নয় ॥

মা'র একটা নির্ভুল ব্যক্তিত্ব ছিল। সচরাচর মেয়েরা যেমন একটা প্যাটার্ন, স্বামীর ব্যক্তিত্ব-নির্ভর ছায়া-ব্যক্তিত্ব, স্বামীর সঙ্গে বিরোধে কোনো মত বা চিন্তার যুক্তিসঙ্গত প্রকাশে বিশিষ্ট নয়, শুধু-মাত্র সাময়িক উচ্ছ্বাস ভাবপ্রবণতা বা জেদের দ্বারা চালিত—মা সে রকমটি ছিলেন না। বাবার আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব মাকে আচ্ছন্ন করে ছিল, তবুও মা নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। দু'জনের মনের মিল ছিল খুব, তাই বলে মা কখনো নিজের ব্যক্তিত্ব বুদ্ধি-বিবেচনা ঈশ্বরে সমর্পণ করার মতো ভালোবাসার নামে সমর্পণ করে বসেননি। বাবাও অবশ্য অবিবেচকের মতো মা'র ওপর কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা কোনোদিন করেননি। যদি তা করতেন, তাহলে, আমার মনে হয়, বিরোধ বাধত। সাধারণ ঝগড়াঝাঁটি নয়, দু'টি ব্যক্তিত্বের বিরোধ, যার পরিণাম মর্মান্তিক হতে বাধ্য। পারস্পরিক ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতির ওপরই স্থিত ছিল বাবা-মা'র দৃঢ় পরিণত ভালোবাসা।

বাবা আমার যতখানি কাছের ছিলেন, মা এক অর্থে ততখানি ছিলেন না। কিন্তু নিকটে থেকেও বাবা যেন হঠাৎ হঠাৎ ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতেন, তাঁর কথায় ব্যবহারে ফুটে উঠত এক অদ্ভুত দূরত্বের সুর। আর মাকে সর্বদাই ঘিরে থাকত এক বিষণ্ণ দূরবর্তিতা, যার নাগাল না পেয়ে মাকে আমি বাবার চেয়ে দূরের ভাবতাম। নইলে স্নেহ-মমতায় মা'র চেয়ে আপন আর কে? বাবার প্রতি ভালোবাসায় মা'র চেয়ে আমার একাত্মই বা আর কে ছিল? হয়তো

বাবার জন্য প্রতি মুহূর্তের শঙ্কাই মাকে অমন বিষণ্ণ ব্যবধানে রেখেছিল।

বাবার মৃত্যুর পর মাকে আমার আরো দূরের মনে হত, যদিও আদর যত্ন ভালোবাসা মমতায় নিবিড়তর। চিন্তার অবধি নেই তাঁর আমার জন্যই।

ডলিমাসি দিদিমা আর আমি এই তিনজনকে ছাড়া মা যেন মানুষজনও আর পছন্দ করছিলেন না। সব সময় নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাইতেন। বিষাদকরুণ চিন্তাকুল তাঁর সেই ছবিটি আমার মনে চিরদিনের মতো আঁকা হয়ে আছে। সৌরেনবাবু মা'র কথা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। তাঁর কথায় শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত। ডলি মাসিকে নিয়ে তাঁর কোনো প্রশ্ন ছিল না। ও বোধ হয় নিজে থেকেই ওর সব কথা তাঁকে বলেছিল। বাবার কথা, আমরা যে চা-বাগিচায় থাকতাম সেখানকার কথা, কোলকাতার কথা সৌরেন-বাবুকে আমার বলতে হয়েছিল। সাধারণভাবে এসব বিষয়ে উনি জিজ্ঞেস করতেন, কিন্তু মা'র কথা উঠলেই উনি যেন বেশি মনোযোগী হতেন। মা'র সম্পর্কে ওঁর এই চিন্তা ও আগ্রহে আমি নিজের মনেরই ছায়া দেখতাম এবং বলা বাহুল্য সব ওঁকে বলতাম।

একদিন এইসব কথাই হচ্ছিল। হঠাৎ সৌরেনবাবু হাঁটু মুড়ে আমার সামনে বসলেন, আমার কাঁধে দুই হাত রেখে, সোজা আমার চোখে তাকিয়ে বললেন--খোকন, তোমরা যদি কখনো কষ্ট পাও, আমিও ভীষণ কষ্ট পাব।

তারপর আলমারির কাছে গিয়ে বই দেখতে থাকলেন। অনেকক্ষণ।

সৌরেনবাবুর এভাবে এ কথা বলার মাথামুণ্ডু খুঁজে পাইনি আমি। বড়দের সব কথার মানে হয় না—শৈশবের এই তত্ত্বজ্ঞানটি এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলাম।

আমি খাটে উঠে শুয়ে রইলাম। একটু পরে সৌরেনবাবু এসে পাশে শুয়ে গল্প করতে লাগলেন।

দেখে-শুনে ওঁকে আমার খুব একা মনে হত। ঠিক লোকজনের অভাবে একা বলতে যা বোঝায় তা নয়। জানতাম না কে কে আছে ওঁর আপনজন, তবে পখশুর কথা শুনে বিশেষ কেউ নেই বলেই মনে হত। কিন্তু সেজন্য ওঁকে একা মনে হয়নি, লোকজনের মধ্যেও যারা একা তাদেরই একজন মনে হয়েছিল। এতটা তলিয়ে নিশ্চয়ই বুঝিনি তখন। কিন্তু ওঁর জন্যে যে সমবেদনা আমার জন্মেছিল তা বোধ হয় এ কারণেই। না বুঝেও শিশুর মনের দর্পণে এমন অনেক ছবি ফোটে যা পরিণত বুদ্ধির মানুষরা বোঝে বুদ্ধি আর যুক্তি দিয়ে। আমি খুব চেষ্টা করতাম সৌরেনবাবুর কাছে ইণ্টারেস্টিং হয়ে উঠতে। উনি যা যা ভালোবাসতেন সেগুলি যথাসাধ্য বুঝতে চেষ্টা করতাম এবং সুযোগ পেলেই সমবয়স্কের স্বরে প্রসঙ্গগুলি উত্থাপন করতাম।

উনি নিশ্চয়ই আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারতেন, হেসে গাল টিপে দিতেন, হয়তো কখনো বলতেন—তুমি আমাকে যেমন বোঝ খোকন, তেমনটি আর কেউ না।

গর্বে আমার বুক ফুলে উঠত।

কি একটা অজুহাতে সৌরেনবাবুকে একদিন খাবার নেমন্তন্ন করল ডলিমাসি। উনি প্রথমে একটু আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু মা সেখানে ছিলেন, তিনিও বলায় রাজী হলেন।

নেমন্তন্নর দিন সকাল থেকেই ডলিমাসি হুলস্থুল শুরু করে দিল। নিরামিষ রান্নার ভার পড়ল মা'র ওপর। মাছ মাংস ডলিমাসি। পখশু, আমাদের বাজার করত। বাজারের মস্ত এক ফর্দ তাকে দিল ডলিমাসি। তাকেও খেতে বলা হল। নেমন্তন্ন পেয়ে পখশু তো বেজায় খুশি।

দিদিমাকেও ধরে এনে কাজে লাগিয়ে দিল ডলিমাসি। পথগুকে বাজারে পাঠিয়ে চান-টান করে রাঁধতে বসে গেল।

গুনগুন করে গান গাইছিল ডলিমাসি আর সবাইকে তাডা দিয়ে দিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলছিল।

মা একটু একটু হাসেন আর বলেন—খাবে তো দু'টি লোক · ···

ডলিমাসির তাডা দেযা তাতে কমে না।

কাজকর্মে আজকাল আর মন নেই দিদিমার। দু'চারটে কি কোটাকুটির পব বলল—নে, হযেছে, আমি এবাব যাই।

বলে উঠে দরজার দিকে চলল দিদিমা।

কিন্তু ডলিমাসি হাত ধরে হিডহিড করে টেনে আনল তাকে—ও বুডি, গুণ বেডেছে তোমাব, ফাঁকি দিতে শিখেছ খুব, না!

—কি আমাব যগ্যিবাডির কাজ! দিদিমা হেসে বলল

—কাজ করতে ইচ্ছে না করে মোডায বসে থাক চুপটি করে, আব আমাদের কাজের খুঁত ধব

মা'ব মনটাও আজ খুশি-খুশি। কাল আমার এক্সরে রিপোর্ট এসেছে। ভালো রিপোর্ট। কাছের শহবে সৌবেনবাবুব এক ডাক্তাব বন্ধু আছেন। দিন কযেক আগে মাকে বলে সৌবেনবাবু আমাকে তাঁর কাছে নিযে গিযেছিলেন। ডাক্তাববাবু আমাকে পরীক্ষা কবেছিলেন, তাঁর কথামতো ছবি তোলানো হয়েছিল।

গোটা বাডিটায যেন সন্ধ্যেব ঠাণ্ডা বাতাসে ভেসে-আসা ফুলের মিষ্টি গন্ধেব মতো খুশির মেজাজ। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। ডলিমাসি গুনগুন করে যে গানটা গাইছিল মা সেটা গাইতে শুরু করলেন। মা গান গাওয়া একদম ছেড়ে দিয়েছিলেন। কতদিন তাঁব গান শুনিনি।

কাজ করতে করতে আনমনাভাবে মা গাইছিলেন, দিদিমা তাঁকে লক্ষ্য করে বলল—তোর গলা ভারি মিষ্টি উষা।

লজ্জা পেয়ে গান বন্ধ করে দিলেন মা।

ডলিমাসি বলল—গা না—

দিদিমা বলল—বন্ধ করলি কেন।

আমি বললাম—গাও না মা।

গাইতে হল মাকে। অনভ্যাসের জড়তা আস্তে আস্তে কেটে গেল, মা তাঁর স্বাভাবিক মিষ্টি গলায় পুরো গানটা গাইলেন।

গান শেষ হতে ডলিমাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মা'র গানের প্রশংসায়। দিদিমা শুধু আস্তে আস্তে বলল—এত গুণ তোর, কিন্তু কি কপাল করেই এসেছিলি!

—মাসি, তুমি একটা যাচ্ছেতাই, ডলিমাসি বলল, বুদ্ধিশুদ্ধি তোমার কোনোকালে হবে না।

আমরা খেতে বসেছি। সৌরেনবাবুর পাশে আমি। অতিথিকে একলা খেতে দিতে নেই। রান্নাবান্না সেরে ডলিমাসি কাপড় পালটে ফিটফাট হয়ে এসে বলেছিল—আমি বাপু আর হেঁশেলে ঢুকছি না, পরিবেশন-টেশন তোমাদের।

আমরা খাচ্ছিলাম। ডলিমাসি কাছে বসে তদারক করছিল।

—আরেকটু মাংস দিক আপনাকে?

—না, বড় বেশি হয়ে গেছে।

—তোমাকে খোকন?

—না।

—মাছের কালিয়াটা কিন্তু আপনাকে একটু নিতেই হবে।

—তাহলে কিন্তু খাওয়াটা অত্যাচারে দাঁড়াবে। হেসে বললেন সৌরেনবাবু।

খুব যত্ন করে খাওয়াচ্ছিল ডলিমাসি। সঙ্গে সঙ্গে গল্পও চালিয়ে যাচ্ছিল। সৌরেনবাবু বিশেষ কথা বলছিলেন না, হুঁ হাঁ দিয়েই সারছিলেন। মা ব্যস্ত ছিলেন পরিবেশন নিয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার পর সৌরেনবাবু মাকে বললেন—আপনারা কিন্তু একদিনও ওপরে এলেন না।

—বেশ তো, মা বললেন, আজ বিকেলে যাব। আপনি বসুন, একটু বিশ্রাম করুন।

—আমরা বরং ওপরেই যাই। কি বল খোকন?

বিকেলে ডলিমাসিকে নিয়ে মা ওপরে এলেন। দিদিমা লজ্জায় আসেনি। ডলিমাসি অবশ্য এর আগেও অনেকবার এসেছে। সৌরেনবাবু তাই মাকেই বিশেষ করে সব দেখাতে লাগলেন।

মাকে বেশ সহজ লাগছিল। আমি ঘরে বসেছিলাম। ব্যালকনিতে সৌরেনবাবু মাকে ক্যাকটাস চেনাচ্ছেন—বছরে একবার মাত্র এ গাছে ফুল হয়, একটিমাত্র ফুল, আশ্চর্য তার রং।

—ভারি সুন্দর তো। মায়ের গলা।

—কোলকাতার বাড়িতে আরো অনেক জাতের ক্যাকটাস আছে। কোলকাতায় ফিরে খোকনকে নিয়ে আসবেন বেড়াতে। মা খুব খুশি হবেন। হ্যাঁ, ক্যাকটাসের শখ আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বলতে পারেন, বাবা বিলেতে থাকতে……

ডলিমাসি হঠাৎ বারান্দা থেকে ঘরে চলে এল। আমার পাশে বসে কপাল রগড়াতে লাগল।

—তোমার অসুখ করেছে ডলিমাসি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—ও কিছু না, মাথা ধরেছে।

—বাবার এক ক্যাকটাস-পাগল সাহেব বন্ধুই শখটা তাঁকে ধরিয়ে-ছিলেন। দু'তিনবার এদেশে এসেছিলেন। একবার আমাদের বাড়িতে থেকেওছিলেন কিছুদিন। আমরা তাঁকে ডাকতাম জেঠু বলে। উনি খুব খুশি হতেন। বেশির ভাগ আকারে-ইঙ্গিতে আর আমাদের জানা দু'চারটে ইংরিজি কথা দিয়ে চলত আমাদের ভাবের আদান-প্রদান।

আমি একমনে শুনছিলাম।

—দেশে ফেরার পথে প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে উনি মারা যান। ওঁর মৃতদেহের পাশে কি পাওয়া যায় জানেন? ওঁর সবচেয়ে প্রিয় এই জাতেরই একটা ক্যাকটাস।

— আশ্চর্য! মা'র গলায় অদ্ভুত একটা ভালো-লাগা।

সৌরেনবাবুর কাছে এমনি আরো কত অপরূপ গল্প আছে আমি শুধু তা-ই ভাবছিলাম।

মা আর সৌরেনবাবু কথা বলতে বলতে বারান্দা থেকে ঘরে এলেন।

ডলিমাসি উঠে বলল—আমি নিচে যাচ্ছি, মাথাটা বড্ড ধরেছে।

—মাথাধরার ওষুধ আছে, সৌরেনবাবু বললেন, দেব?

—না, থাক।

কেমন যেন খাপছাড়াভাবে চলে গেল ডলিমাসি।

মা আর সৌরেনবাবু পুরনো বন্ধুর মতো সহজভাবে আলাপ করছেন। আমার বেশ লাগছে।

দেয়ালে টাঙানো সেই সুন্দরী মহিলার ছবিটি দেখিয়ে মা একসময় বললেন—উনি?

—আমার স্ত্রী। সাত বছর হল মারা গেছেন। বিয়ের পর একটা বছর আমরা এই বাড়িতে ছিলাম।

আমার মনটা হঠাৎ ভীষণ খারাপ হয়ে গেল, মা'র দিকে চেয়ে দেখি তাঁরও মুখ থমথম করছে।

—আপনার ছেলেমেয়ে? একটু বাদে মা বললেন।

—একটিই মাত্র ছেলে আমার ছিল, সেও মায়ের সঙ্গে একই রাত্রে—

কি রকম অদ্ভুত একটু হেসে সৌরেনবাবু টেবিলের ওপর থেকে একখানা বই তুলে নিলেন।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ আমরা সবাই যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গেলাম।

পথশুদ্ধ চা দিয়ে যেতে আবার একটু সহজ হতে পারলাম আমরা।

চা খেতে খেতে সৌরেনবাবু বললেন—আমাদের কোলকাতার বাড়িতে কিন্তু নিশ্চয়ই যাবেন। মা পুরনো মানুষ, কিন্তু নতুনপন্থী। তাঁকে আপনার ভালোই লাগবে। খোকন, তোমার মা ভুলে গেলে তুমি মনে করিয়ে দিও কিন্তু।

॥ দশ ॥

ডলিমাসিটা যেন কি! ওকে বোঝা দায়।

আমরা নিচে নেমে দেখি ও একলা বেড়াতে বেরুচ্ছে, অথচ একটু আগেই মাথা ধরেছে বলে চলে এল।

—কি রে, একলা বেরুচ্ছিস যে বড়। মা বললেন।

—কি করব না বেরিয়ে, তোমাদের গল্পই ফুরোয় না।

—কিন্তু তোর যে মাথা ধরেছিল!

—সেইজন্যেই তো আরো বেরুচ্ছি। হাওয়ায় মাথা ছাড়বে।

কথাগুলো বলে ডলিমাসি আর অপেক্ষা করল না। গেট খুলে বেরিয়ে গেল।

মা সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে অবাক আর চিন্তিত দেখাচ্ছিল। ডলিমাসি কোনোদিন একলা বেড়াতে যায়নি অন্তত দিদিমাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

—কি হল রে উষা? ডলির কথা ভাবছিস? ওর অমন হয়।

পেছনে তাকিয়ে দেখি দিদিমা।

যদিও দিদিমা কথাগুলি হালকা করেই বলার চেষ্টা করছিল, তবু তার গলায় উদ্বেগ।

মা বললেন—আশ্চর্য……

—তুই ওর সবটা জানিস না, আমরা জানি। যাক, এ নিয়ে মিথ্যে ভাবিসনে।

সেদিন আমরা বেড়াতে গেলাম না। মা খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন।

ডলিমাসি যেন রাতারাতি পালটে গেল। কারো দিকে মন নেই, এমন কি আমাকেও এড়িয়ে চলতে চায়। সবাইকে মাতিয়ে রাখত যে তাকেই এখন সব কিছুতে ডেকে আনতে হয়। একলা একলা বেড়াতে যায়। আগে থেকে বলে রাখলে আমাদের সঙ্গেও যায়, কিন্তু দল থেকে অনেকটা এগিয়ে না হয় পিছিয়ে থাকে। রান্নাবান্না ঘরসংসারের কাজ থেকে একদম সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে। তাই দিদিমাকে আবার খানিকটা ঝামেলা নিতে হয়েছে। সাজগোজ করার ইচ্ছেটা যেমন হঠাৎ দেখা দিয়েছিল তেমনি হঠাৎ আবার মিলিয়ে গেছে। আমাদের নিবিড় সম্পর্কটা যেন অগোছাল এলো-মেলো হয়ে যাচ্ছিল। আমার কি রকম ভয়-ভয় করছিল। দিদিমা ডলিমাসির ওপর চটে গেছে। ছোটখাট ব্যাপারে দু'একটা কথায় তার সেই রাগ বোঝা যায়। ডলিমাসি আগের মতো হেসে উত্তর করে না, চুপচাপ মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। মা ডলিমাসি সম্পর্কে একেবারে নীরব হয়ে গেছেন, খুব দরকারী দু'একটা কথা ছাড়া ওর সঙ্গে কথাই বলেন না। অকারণে ডলিমাসির এ ছেলেমানুষি মা বরদাস্ত করতে পারছেন না। কি চায় ও? ওর যদি কোনো রাগ থাকে কারুর ওপর সে কথা ওর স্পষ্ট করে বলা উচিত। এখানে কেউ ওর শত্রু নয়। কিন্তু ডলিমাসি যেন জেদ করেই সবাইকে তাচ্ছিল্য করছে। ডলিমাসির পরিবর্তন এত আকস্মিক ও অভাবিত যে আমার যেন তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না, মনে হচ্ছিল ডলিমাসি যেন থিয়েটারে পার্ট করছে। পথশু পর্যন্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। সে আমাকে চুপি চুপি বলল—ডলি দিদিমণির কি হইসে খোঁখাবাবু?

এ ব্যাপারে আমার মধ্যে যে ভাবান্তর এসেছিল সৌরেনবাবুর চোখ তা এড়িয়ে গেল না।

—তোমার কি হয়েছে খোকন? কি ভাব এত?

মনের ভার হালকা করার সুযোগ খুঁজছিলাম একটা। তাই উনি কথাটা বলামাত্র যা যা লক্ষ্য করেছি সব বললাম ওঁকে।

উনি শ্রোতা খুব ভালো, শুনলেন মন দিয়ে, তারপর বললেন—এই কথা, ও কিছু না, এ নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না।

কি উনি বুঝেছিলেন বা ভেবেছিলেন জানি না। আমি কিন্তু খুব আশ্বস্ত হতে পারলাম না।

পথগুর চালাঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে দিদিমা আর ডলিমাসি কথা বলছিল। আমি ঘুরঘুর করতে করতে ওখানটায় গিয়ে পড়েছিলাম। আমি একপাশে ছিলাম, ওরা আমাকে দেখতে পায়নি।

দিদিমা বলছিল—এ তুই ভালো করছিস না ডলি। তোর বরং চলে যাওয়াই ভালো।

—কেন, চলে যাব কেন? কি করেছি আমি? ঝেঁজে উঠল ডলিমাসি।

—জানিস না কি করছিস?

—না, জানি না। যদি কারো খারাপ লাগে সে চলে যেতে পারে। এটা ভাড়াবাড়ি, এখানে ভাড়া দিয়ে যে কেউ থাকতে পারে, আমিও পারি।

মনে হল দিদিমা এবার রাগ করবে, কিন্তু হঠাৎ তার গলা নরম হয়ে এল—আমি সব বুঝি ডলি। কি করবি বল্, সবই তোর অদৃষ্ট।

—কি বলছ যা-তা, তোমার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে না চাইলে কেউ বোঝাতে পারে না।

পা টিপে টিপে সরে এলাম আমি। মাকে ঘটনাটা বলিনি। বললে বড়দের কথা লুকিয়ে শোনার জন্য মা রাগ করতেন।

কিন্তু আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল—কেন তোমরা অমন করছ? যদি ঝগড়া থাকে মিটিয়ে নাও। যদি মিটিয়ে নেবার মতো ঝগড়া না হয় এটা, তবে আমাকে জানতে দাও, বুঝতে দাও, আমি যে তোমাদের একেবারেই বুঝতে পারছি না ····

॥ এগারো ॥

এখন চেঞ্জের সময়। আশপাশের বাড়িতে অনেক লোকজন এসেছিল। তাদের অনেকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল। সকলে মিলে একদিন চণ্ডীপাহাড়ের ঝরনায় চড়ুইভাতি করতে যাওয়া ঠিক হল। পাহাড়ের নিচে পর্যন্ত যাওয়া হবে একায়। তারপর উটের পিঠে করে মালপত্র যাবে চড়ুইভাতির জায়গা পর্যন্ত। আমরা হেঁটে। কুণ্ডের জলে রান্নাবান্না স্নান। সারাদিন হৈ হৈ করে কাটানো। ধরবাবু বলে সেই ভদ্রলোক, যাঁর উৎসাহ সবচেয়ে বেশি, তিনি সঙ্গে সঙ্গে লোকের নাম আর জিনিসপত্রের ফর্দ করে ফেললেন। বুড়োবুড়ি কচিকাঁচা কেউ বাদ গেল না। রান্নার আয়োজন দু'দফা। বিধবাদের তো আর আঁষের উনোনে খেতে বলা যায় না। মা দিদিমা সৌরেনবাবু আর আমি তো যাবই। ধরবাবুর অনুরোধে ডলিমাসিও রাজী না হয়ে পারল না। আমার রীতিমতো উত্তেজনা হচ্ছিল। দারুণ মজা হবে একটা। তা ছাড়া কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছিল চড়ুইভাতিতে গিয়ে ডলিমাসি আর রাগ করে থাকতে পারবে না, আবার আমরা সবাই আগের মতো হয়ে যাব।

ডলিমাসির ভাবান্তর আমরা একরকম মেনেই নিয়েছিলাম। ওর হাবভাব আমাকে আর তেমন ভাবাত না। দিদিমাকেও আর

বকাবকি করতে শুনিনি। আস্তে আস্তে মাও ওর অবুঝ ব্যবহার করুণা-মেশানো প্রশ্রয়ের চোখে দেখতে শুরু করেছেন। ওর খুব নেওটা হয়ে আমি ওর মনের বরফ গলাতে চেষ্টা করি. কিন্তু গা-আলগা আদরের বেশি কিছু পাই না। কিছু মনে করি না তাতে, মা আর দিদিমার দেখাদেখি আমিও ওকে অবুঝ ভাবতে শিখে নিয়েছি। অবশ্য ডলিমাসির রহস্যটা আমার কাছে রহস্যই থেকে যায়।

এ অবস্থায় চড়ুইভাতির আয়োজনে খুব খুশি হলাম। ওখানে গিয়ে কি আর ডলিমাসি রাগ করে থাকতে পারবে!

চড়ুইভাতির আগের দিন রাতে আমার একটু জ্বর-জ্বর হল। যাওয়ার লোভে লুকোতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মা'র কাছে ধরা পড়ে গেলাম। আমার সামান্য কিছু হলেই মা ভীষণ ঘাবড়ে যান। সকাল হতেই পথগুকে দিয়ে সৌরেনবাবুকে খবর পাঠালেন।

সৌরেনবাবু এসে ডাক্তারের মতো আমার নাড়ি টিপে দেখে বললেন—সামান্য গা গরম। ও কিছু না। আজ ভাত দেবেন না।

মা আশ্বস্ত হয়েছেন বলে মনে হল না, বললেন—তবু...ডাক্তার-বাবুকে একবার খবর দেয়া যায় না?

আমার মনে হল সৌরেনবাবুর ঠোঁটের কোণে ছোট্ট একটু হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল পরক্ষণে।

উনি বললেন—আপনি চিন্তা করবেন না। আমি পথগুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি টাউনে, ও ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

এ অবস্থায় চড়ুইভাতিতে যাওয়ার আবদার যে নেহাতই বোকামি তা বুঝে ও কথা আর তুললাম না। সৌরেনবাবুর সমর্থন থাকলেও মা'র আপত্তি থাকবেই।

ধরবাবু আমাদের ডাকতে এলে মা আমার অসুখের জন্য যেতে পারবেন না বলে দিলেন। দিদিমাও যেতে চায়নি, মা তাকে বলে-কয়ে রাজী করালেন। ডলিমাসি মাকে শুধু 'যাচ্ছি উষা' বলে এক্কায় গিয়ে উঠল। ডাক্তারবাবু আসছেন, তিনি আবার

সৌরেনবাবুর বিশেষ বন্ধু, তাই উনিও থেকে গেলেন। 'ফিস্টিটাই মাটি হয়ে গেল' এইসব বলতে বলতে ধরবাবু দলবল নিয়ে যাত্রা করলেন।

ওরা চলে যেতে মা বললেন—আপনি গেলে পারতেন।

উত্তর না দিয়ে সৌরেনবাবু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন।

দুপুর নাগাদ ডাক্তারবাবু এসে পড়লেন। দত্যির মতো চেহারা তাঁর, টকটকে ফর্সা রং। কথা বললে গমগম শব্দ হয়। কথায় কথায় ছাদ ফাটিয়ে হাসেন। আধ মিনিটে আমার পরীক্ষা শেষ করে বললেন—কিছু হয়নি, জ্বর এমনিই ছেড়ে গেছে। মিথ্যে আমাকে টেনে আনলে সৌরেন।

—মিসেস মিত্রের জন্যেই । উনি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

—তাহলে অবশ্য বলার কিছু নেই, বলে ডাক্তারবাবু একটু হাসলেন, যাক শোন, এনে যখন ছেড়েইছ, খাওয়ার ব্যবস্থা কর, না খেয়ে ছুটতে পারব না।

—যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আমিই দু'টি ···। মা বললেন।

—আপত্তি কি বলছেন! সৌরেনের মুখ থেকে আপনার অজস্র প্রশংসা শুনেছি, রান্নার প্রশংসা তার মধ্যে একটা।

ওপর থেকে চান-টান করে এলেন ডাক্তারবাবু।

এসে বললেন—সৌরেনের সঙ্গে একটু বিশ্বাসঘাতকতা করব, তাই একলা চলে এলাম।

মা হাসিমুখে বললেন বলুন।

—দেখুন, ছেলের জন্যে একটু বেশি দুশ্চিন্তা থাকা আপনার দিক থেকে খুবই স্বাভাবিক। ওর আসল রোগটা এখন সেরে গেছে। তবে রিলাপ্‌স্‌ যাতে না করতে পারে সেজন্য ভালো একজন ডাক্তারের চিকিৎসায় থাকা দরকার। কোলকাতায় ভাবনা

নেই, কিন্তু এখানে দু'চারটে হাতুড়ে বদ্যি ছাড়া কাউকে পাবেন না। আমি তো থাকি দশ মাইল দূরে, পেশেন্টকে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধে, আমার পক্ষে সময় করে রেগুলার আসাও সম্ভব নয়। তার চেয়ে এক কাজ করুন, খোকনের চিকিৎসার ভার সৌরেনকে নিতে বলুন।

—সৌরেনবাবু! উনি?

—ডাক্তার। আমার চেয়ে অনেক বড় ডাক্তার। দু'দুটো বিলিতি ডিগ্রী আছে ওর।

—অথচ আমাদের জানতেই দেননি যে উনি ডাক্তার!

—কারণ একটা আছে। ডাক্তারি ও ছেড়ে দিয়েছে। ডাক্তার বলে পরিচয় পর্যন্ত দেয় না।

—কেন?

—সেইটাই আপনাকে বলব, ডাক্তারবাবু একটু চিন্তিতভাবে বললেন, আপনার জানা দরকার বলে আমি মনে করি। সৌরেনের মেডিসিনের জ্ঞান অদ্ভুত ভালো। কিন্তু অনেক বড় মেডিসিনম্যানের মতো ওরও একটা অহংকার ছিল, মেডিসিনকে সব সময় ও সার্জারির চেয়ে বড় মনে করত। পারতপক্ষে কোনো কেস সার্জারিতে রেফার করতে চাইত না, সেটা যেন সার্জারির কাছে মেডিসিনের হার। স্ত্রীকে সৌরেন অত্যন্ত ভালোবাসত, চমৎকার মেয়ে ছিল নন্দিতা। ও কিডনির একটা কমপ্লিকেশনে ভুগছিল। মেডিসিনে যা কিছু করা সম্ভব সবই করেছিল সৌরেন। কিন্তু উচিত ছিল অপারেশন করানো। কিন্তু কেউ অপারেশন সাজেস্ট করলেই ও নন্দিতার দুর্বল শরীরের অজুহাত দেখাত। আসলে ভেতরে ভেতরে গোঁড়া মেডিসিনম্যানের জেদটাই কাজ করছিল বলে মনে হয়। কিংবা হয়তো সত্যিই ও বিশ্বাস করত মেডিসিনে সব সম্ভব। কি জানি……

—তারপর?

—একদিন রাত্রে অবস্থা খারাপের দিকে টার্ন নিল। সৌরেন যেভাবে চিকিৎসা করছিল তাতে এ অবস্থা হওয়ার কথা নয়, তবু

হল। সেই রাত্রেই হাসপাতালে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হল, বড় সার্জন অপারেশন করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, অপারেশন টেব্‌লেই সব শেষ। আর কি অদ্ভুত ভাগ্য দেখুন, ওর বাচ্চা ছেলেটাও সেই রাত্রেই দু'বার বমি করে কোলাপ্‌স্‌ করল, বাচ্চাটাকে কোনো ওষুধ দেবার সুযোগই সৌরেন পায়নি।···পরদিন থেকে ও উধাও। দু'মাস পরে ফিরে এসে হাসপাতালে রেজিগনেশন দিল। চেম্বার তুলে দিল। আমাদের কথার উত্তরে শুধু বলল—আমি ডাক্তার হবার উপযুক্ত নই। অথচ ওর স্ত্রীর চিকিৎসা ও নির্ভুল করেছিল। আমাদের এক মাস্টারমশাই, যিনি নন্দিতার অপারেশন করেছিলেন, তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন সৌরেনের চিকিৎসায় কোনো ভুল ছিল না। আনপ্রীডিক্‌ট্যাবল ব্যাপার মেডিক্যাল সায়েন্সে হামেশাই ঘটে থাকে। কিন্তু সৌরেনকে কোনো কথাই বোঝানো গেল না। এ কাহিনী আপনাকে বলে হয়তো বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতাই করলাম·····কিংবা হয়তো সত্যিকারের বন্ধুর কাজই করেছি। আমি চাই সৌরেন আবার ডাক্তারিতে ফিরে যাক। ওর মতো সৎ মানুষের এ লাইনে আজ বিশেষ প্রয়োজন। আপনার ছেলেকে ও খুব ভালোবেসে ফেলেছে, আমি ওর এই ভালোবাসার সুযোগ নিতে চাই, খোকনের চিকিৎসার ভার ওকে নিতে বলুন, ওর মিথ্যে জেদটা ভেঙে দিন।

মা নীরব বিস্ময়ে ডাক্তারবাবুর কথা শুনছিলেন, তাঁর কথা শেষ হতে আস্তে আস্তে বললেন—বলব। আমি তাঁকে অনুরোধ করব।

মা তাঁকে বলবার অবকাশ পেয়েছিলেন কিনা জানি না। বলবার প্রয়োজন হয়নি বলেই আমার ধারণা।

চড়ুইভাতিতে যেতে না পারার দুঃখ আমার কিছুটা কেটে গিয়েছিল ডাক্তারবাবুকে পেয়ে। সারাটা দুপুর হেসে আর হাসিয়ে বিকেলে উনি উঠলেন। ওঁকে স্টেশনের রাস্তায় একায় তুলে দিয়ে ফিরে এসে

গেটের সামনে সিমেণ্ট-বাঁধানো আসনে আমরা বসেছিলাম। আমুদে মানুষ ডাক্তারবাবু যেন আমাদের আরো কাছাকাছি করে দিয়ে গেছেন। আমাদের কোনো কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারেও মা সৌরেনবাবুর মতামত নিচ্ছিলেন। কিন্তু সৌরেনবাবু সম্পর্কে ডাক্তারবাবু যা বলে গেছেন সে ব্যাপারে মা'র মতো আমিও নীরব ছিলাম। তবে উনি যে মস্ত বড় ডাক্তার এ কথাটা জানতে পেরে আমার খুব গর্ব হচ্ছিল। কথাটা কাউকে বলতে পারলে তখন আমি সত্যিই খুব খুশি হতাম।

সামনের রাস্তা দিয়ে কয়েকটা এক্কা হৈ হৈ করে চলে গেল। চড়ুইভাতির দল ফিরছে। একটা এক্কা এসে থামল গেটের সামনে। ডলিমাসি আর দিদিমা নেমে বাড়ির দিকে আসতে লাগল। এক্কা থেকে নামার সময়ও আমি ডলিমাসির হাসি-হাসি মুখ দেখেছিলাম। কিন্তু আমাদের কাছাকাছি আসতেই ওর মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল।

মা তাকে ডেকে বললেন—কি রে, কেমন ফিস্টি হল তোদের?

উত্তরে ডলিমাসি কোনো কথা না বলে বিশ্রীভাবে একবার তাকিয়ে চলে গেল। মা'র মুখখানা যেন নিবে গেল, কেমন অসহায়-ভাবে চেয়ে রইলেন।

ঘরের আলো নেবানো ছিল। মা আমার পাশে আধশোয়া হয়ে চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিলেন। বিলি কাটলে আমি খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছিল। আমি কি সব ভাবছিলাম। ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে জলের মতো অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিল, মুহূর্তের জন্য চেতনার পর্দায় ফুলকির মতো ফুটে উঠেই আবার লুপ্ত হচ্ছিল অন্ধকারে, আর এইসব চিন্তার সম্পর্কবিহীন কতগুলি ছবি প্রতিফলিত হচ্ছিল ইতস্তত। কুয়াশার মতো ঘুম আমাকে ঘিরে ঘন হয়ে উঠছিল।

হঠাৎ ঘুম ও জেগে থাকার মাঝখানের অনিশ্চয়তা থেকে চকিতে প্রখর জাগরণে প্রত্যাবর্তন করলাম। মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত কয়েকটা শব্দ নিমেষে স্নায়ুকেন্দ্র থেকে অবসাদ সরিয়ে ফেলে মনকে সজাগ তীক্ষ্ণ করে তুলল।

—আমি কাল চলে যাচ্ছি। ডলিমাসি বলছিল।

—কেন? মা যেন চমকে উঠলেন।

ডলিমাসি কোনো উত্তর দিল না।

মা আবার বললেন—কেন, চলে যাবি কেন?

- না জানার ভান করিস না উষা।

—সত্যিই জানি না আমি কি করেছি।

—তবে আর জেনে দরকার নেই।

—দরকার আছে। কিছুদিন ধরে তোর ব্যবহারের কোনো মাথামুণ্ডু পাচ্ছি না। যখনই কথাটা তুলতে গেছি তুই পাশ কাটিয়ে গিয়েছিস। তুই যে আমার কত বড় উপকার করেছিস ডলি······ চিরদিন তা স্বীকার করব। যদি কোনো অন্যায় করে থাকি সে কথা আমাকে স্পষ্ট করে বল্‌ ····

—ন্যাকা সাজিসনে উষা, ডলিমাসি চাপা গলায় হিসহিস করে উঠল, খোকনের ভালোর জন্যে তোরও এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।

—তার মানে?

—সৌরেনবাবুর সঙ্গে তোর ঘনিষ্ঠতার এই মানেই হয়।

—ডলি, মা চাপা বিরক্ত স্বরে বললেন, চলে যেতে চাস যা, কিন্তু ছি ছি······

—তোর যা ইচ্ছে কর্‌। আমি কাল চলে যাচ্ছি।

—আমাকে নিরুপায় জেনেও অকারণে জুলুম করছিস। খোকনের শরীর ভালোভাবে না সারতে আমি কি করে যাই······

পায়ের শব্দে বুঝলাম ডলিমাসি চলে গেল। অনুভব করলাম মা

নিঃশব্দে কাঁদছেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাইলাম। কিন্তু ঘুমের অভিনয় তাহলে ধরা পড়ে যা.ব যে। ডলিমাসি কি পাগল হয়ে গেছে? কি সব আবোল-তাবোল বলে গেল। সৌরেনবাবু এর মধ্যে আসেন কোত্থেকে? তাঁকে নিয়ে রাগ কেন ডলিমাসির? ডলিমাসির রাগ বিরক্তি আমার কাছে দুর্বোধ্য। ওর চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা যেন একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। ওকে আমি কিছুদিন ধরে বয়স্ক শিশুর মতো ভাবছি, ওর মান-অভিমান অযৌক্তিক ঠেকেছে, কিন্তু যে পারিবারিক একতা আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে দিয়ে ও যে এমন করে চলে যেতে পারবে সে আশঙ্কা কিন্তু আমার কখনো হয়নি। মা কাঁদছেন, সেই কান্নার অন্তরালবর্তী অসহায়তা শঙ্কা আমাকে বিদ্ধ করছে। আমি চোখ মেলে ভয়ে ভয়ে চাইলাম। মা অন্যদিকে মুখ ফিবিয়ে শুয়ে আছেন। কাচের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরের অন্ধকার। ঘোর কালো আকাশে তারাগুলি ভীতি-জনক দূরত্বে জ্বলজ্বল করছে। আবার চোখ বুজলাম। ··আমার কল্পনার প্রসন্ন গৃহখানি ভেঙে যাচ্ছে ··· সেই গৃহ যেখানে মা আমি ডলিমাসি দিদিমা পথশু আর মাঝে মাঝে পারিবারিক বন্ধু হিসেবে সৌরেনবাবু, আলো, বাগান, পাখি ··

অসহনীয় মনে হচ্ছে এই সময় ও অন্ধকার! অন্ধকার! বয়স্ক মানুষেরা এত নির্বোধ কেন? কেন অকারণে ডলিমাসি সবাইকে কষ্ট দিতে চাইছে? বড়দের দুর্বোধ্য আচরণের প্রকাণ্ড উঁচু দেয়ালে আমার চোখের আলো প্রতিহত। ওরা স্পষ্ট করে, আমার বোঝার মতো করে কথা বলে না কেন?

কতক্ষণ জেগেছিলাম জানি না। মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। অন্ধকার দৃষ্টিবেধ্য এখন। কিন্তু সব কিছু অপরিচয় ও ভয়ের কুয়াশায় জড়ানো। মায়ের নিদ্রিত মুখখানা শুধু শ্রান্ত, কোমল, করুণ, প্রিয়। তাঁর মাথায় হাত রাখলাম। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিলাম। ঘুমের মধ্যেই মা হাত বাড়িয়ে আমাকে খুঁজলেন। আমি ঘন হয়ে তাঁর বুকে মিশে

গেলাম। আর তখন ভয়টা তীব্র হয়ে উঠল। মনে হল আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। কারো ওপর সেই সর্বনাশের দায়িত্ব না চাপাতে পারলে, কাউকে দোষী ভাবতে না পারলে আমি যেন স্থির হতে পারছিলাম না। কে দায়ী? ডলিমাসি? দিদিমা? মা? আমি? কে? ডলিমাসি ঝগড়া করছে কেন? কেন চলে যাচ্ছে? জানি না, জানি না····। ক্রমে আমার মনে অবয়বহীন এক অদ্ভুত বিদ্বেষের জন্ম হল। সম্পূর্ণ অহেতুক—যেন এক সহজাত বিদ্বেষ অনুভব করলাম সৌরেনবাবুর প্রতি। আমার জন্য তাঁর স্নেহের সব পরিচয় ছাপিয়ে আমি তাঁর প্রতি প্রবল শত্রুর মতো বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠলাম।

॥ বারো ॥

বাড়িটা থমথম করছে। আমি মা'র আড়ালে আড়ালে ছায়ার মতো ফিরছিলাম। বিশ্রী একটা মন-কেমন-করা ভাব আমাকে পেয়ে বসেছে।

দশটায় ট্রেন। ডলিমাসি গোছগাছ করে নিচ্ছিল। দিদিমাও দেখলাম ট্রাঙ্ক গোছাচ্ছে। দিদিমাও চলে যাচ্ছে? মাকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম না।

মা উনোন ধরাননি। স্টোভ জ্বেলে দুধ গরম করে আমাকে খেতে দিলেন। খেতে ইচ্ছে ছিল না, তবু তাঁকে বিরক্ত করতে চাই না বলে খেয়ে নিলাম।

পখণ্ডু আসতে ডলিমাসি বলল—পখণ্ডু, একটা এক্কা ডেকে দিও। দশটার ট্রেনে আমরা যাচ্ছি।

—আপলোগ চলা যাতে! পখণ্ডু আকাশ থেকে পড়ল।

—সবাই না। আমি আর বুড়িমা যাচ্ছি।

—কাঁহে, পখণ্ডু বোকার মতো হাসতে চেষ্টা করল, ই জাগা আপ দোনোকো আচ্ছা লাগছে না?

—তা নয়, কাজ আছে কোলকাতায়। ডলিমাসি বাক্স গোছা-নোয় মন দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে সে প্রশ্ন পছন্দ করছে না।

ডলিমাসির ঘরের দরজায় মা দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাঁর পেছন থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিচ্ছিলাম। ডলিমাসি কাপড়-চোপড় গুছিয়ে তুলে রাখছে, এটা তুলছে ওটা নামাচ্ছে, হোল্ডলটা বিছিয়ে-রাখা—বাঁধার অপেক্ষায়।

আমাব হাত ধরে মা আমাদের ঘরে ফিরে এলেন। মা যেন ছোট্ট মেয়েটি, তাঁকে এমনি অসহায মনে হচ্ছে। চুপটি করে বসে থাকলাম তাঁর পাশে।

খানিক বাদে দিদিমাও আমাদের ঘরে এসে মা'র পাশে বসল।

কিছু বলতেই এসেছে দিদিমা, কিন্তু বলতে পারছে না। মুখখানা কাঁচুমাচু।

অনেকটা সময নিয়ে দিদিমা তারপর বলল—ডলি চলে গেলে আমার এখানে থাকা ভালো দেখায় না।

—তা আমি জানি মাসিমা, মা বললেন, তুমি যেতে না চাইলে ও হয়তো ঝগড়াই শুরু করে দেবে তোমার সঙ্গে।

—তুই একা কি করে খোকনকে নিয়ে থাকবি উষা? যেতে আমাব একদম ইচ্ছে ছিল না রে।

—থাকতে আমায় হবেই। এখানে এসে খোকনের শরীর অনেকটা সেরেছে। ওকে একেবারে সুস্থ করে নিয়ে যেতে চাই। কিন্তু মাসিমা, ডলি · ডলি কেন ··

—তুই ওর অ্যাদ্দিনকার বন্ধু, তুই জানিস না কিছু? শুধোসনি কখনো কেন ও বিয়ে-থা কবেনি?

—হ্যাঁ, তা করেছি, বলেছে ভালো লাগে না তাই।

—তা নয় রে, ঘরসংসারের সাধ ওর খুব, কিন্তু ও বিয়ে করলে তার চাইতে বড় অন্যায়···

—খোকন, মা ডাকলেন, তুমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসো।

গুটিগুটি ডলিমাসির ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওর বাঁধা-ছাঁদা প্রায় হয়ে গিয়েছে। আমাকে দেখে ডাকল—খোকন, এসো।

—তুমি চলে যাবে ডলিমাসি? আমি কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে শুধোলাম।

—হ্যাঁ, খোকন।

—আমি কি করে একলা থাকব? আমি খুব করুণভাবে বললাম। ডলিমাসির মন ভেজাতে চাইছিলাম।

ও কোনো উত্তর দিল না, মাথা নিচু করে রইল। তারপর যখন মুখ তুলল দেখি চোখ দু'টি ছলছল করছে। বলল—তুমি কোলকাতায় ফিরে গেলে আমরা একদিন চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যাব। খুব মজা হবে।

বুঝলাম ডলিমাসির যাওয়া অনিবার্য। ওর কথার মধ্যে সেই সুরটা ছিল। তাই ওর যাওয়ার প্রসঙ্গে আর কোনো কথা বললাম না। অন্য দু'একটা কথা হল। ওর 'পরে আমার অভিমান অনেকখানি ধুয়ে-মুছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা অভিমান, আরেকটা ক্ষোভ, যার লক্ষ্য সৌরেনবাবু, তীব্র হয়ে উঠল।

ডলিমাসিদের নিয়ে যেতে এক্কা আসতে মা বাইরে এলেন। তাঁর সঙ্গে দিদিমা। এতক্ষণ তাঁরা বসেছিলেন একসঙ্গে। মাকে অনেক স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। কে জানে কি কথা হয়েছে তাঁদের।

পথগু মালপত্র এক্কায় তুলে দিয়ে গাড়োয়ানের পাশে বসল।

দিদিমা খুব কাঁদতে লাগল। আমাকে কোলে টেনে সে কি কান্না। আমার গাল ভিজে গেল দিদিমার চোখের জলে। নোংরা ঘিঞ্জি বাড়িতে দুঃখের মধ্যে দিদিমা আর ফিরে যেতে চাইছে না বুঝি। এমন খোলা আকাশের নিচে আর বোধ হয় কোনোদিনই সে এসে দাঁড়াতে পারবে না। ওর ছেলেরা জেলে, ঘরদোর বেওয়ারিশ পড়ে আছে, তবু দিদিমা তার মনের শান্তি এখানে

এসেই পেয়েছিল, পালটে গিয়েছিল এমন একটা নতুন মানুষে যাকে আগের মানুষটার সঙ্গে মেলানোই যেত না। দিদিমার কান্না আর থামে না দেখে মা বললেন—কাঁদছ কেন মাসিমা, আমরা আবার তোমার কাছেই যাব।

কান্না চেপে ভাঙা গলায় দিদিমা বলল—আমি তোর ঘরদোর আগলে রাখব, কোনো চিন্তা করিসনে। তারপর গলা নামিয়ে—টাকার টান পড়লে লিখিস, পাঠিয়ে দেব।

মা ম্লান হেসে বললেন—আচ্ছা।

ডলিমাসি এক্কায় উঠে বসেছে। মা তাকে বললেন—পৌঁছে চিঠি দিস ডলি। তোর সঙ্গে বোঝাপড়া কোলকাতায় ফিরে করব।

মা'র কথার উত্তরে অন্যদিকে তাকিয়ে ডলিমাসি বলল—হুঁ।

ডলিমাসির ভাব দেখে আমার হাসি পেল।

মা'র মুখে করুণা-মেশানো সেই প্রশ্রয়ের হাসি। যেন ডলি-মাসির 'পরে আর কোনো রাগ নেই। এক্কায় ওঠার আগে ডলি-মাসি আমাকে একপাশে নিয়ে চুমু খেয়েছিল, একমুঠো টাকা পকেটে গুঁজে দিয়ে বলেছিল—কিনে দিয়ে যেতে পারলুম না, এ দিয়ে তুমি রসগোল্লা খেও।

এক্কা ছেড়ে দিল। যতক্ষণ না টিলার বাঁকে এক্কাটা মিলিয়ে গেল আমি আর মা দাঁড়িয়ে রইলাম ঐখানে।

ফিরে দেখি সৌবেনবাবু নিচে নেমে এসেছেন। উনি অবাক একেবারে।

—ব্যাপার কি? ওঁরা চললেন কোথায়?

—কোলকাতায়। মা বললেন।

আমি রাগ করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

—হঠাৎ! এভাবে?

—ডলি থাকতে চাইল না।

—ভদ্রমহিলাকে বোঝা মুশকিল, সৌরেনবাবু কপাল কোঁচকালেন, কিন্তু আপনারা একলা থাকবেন কি করে?

—থাকব। মা অর্থহীনভাবে বললেন।

—যা হোক, সৌরেনবাবু একটু পরে বললেন, কোনো অসুবিধে হলে আমাকে জানাবেন।

সারাদিন মা'র কাছে কাছে রইলাম। সৌরেনবাবুর কাছে দোতলায় গেলাম না। গোটা একতলায় আমরা দু'জন মাত্র লোক—মা আর আমি। রোদ্দুরে বাইরেটা ধূ ধূ করতে লাগল আর দুপুরের একলা-একলা ভাবটা বাড়িটায় সেঁধিয়ে পড়ল, অল্পস্বল্প মানুষজন আর এক্কা টাঙ্গাও পথে নেই, পথগুর টিয়া আর ময়না ঘরে এখন, একটা আবছা টিহিট্রি টিহিট্রি শব্দ ভাসছে বাতাসে। আমি নানারকম অদ্ভুত কথা ভাবতে লাগলাম—ভয়ের কথা, দুঃখের কথা। অনেকগুলি দুপুর এই বাড়িটায় কেটেছে। ডলিমাসি আর দিদিমা থাকতে, ওরাও প্রায় রোজই দুপুরে ঘুমোত, কিন্তু তখন এসব ভাবনা হত না আমার, ঐ টিহিট্রি টিহিট্রি শব্দটা দূর থেকে ভেসে-আসা মিষ্টি বাজনার মতো লাগত।

রোজকার মতো সেদিনও আমরা বেড়াতে বেরুলাম। সঙ্গী ছিলেন সৌরেনবাবু। আমি এগিয়ে এগিয়ে হাঁটছিলাম ওঁর কাছাকাছি হতে চাইছিলাম না বলে।

ঘুম আসছিল না। পা টিপে টিপে জানলার কাছে গেলাম।

কালো ভেলভেটে বসানো চুমকির মতো তারা আকাশে। বাগানের গাছগাছালি অন্ধকারের মাঝে মাঝে আরো ঘন চাপ চাপ অন্ধকারের মতো। শার্সিতে হাত ছোঁয়ালাম। কনকনে ঠাণ্ডা। বিরাট জন্তুর মতো টিলার ওপারে আকাশের খানিকটা ফিকে রাগী লাল। ওখান থেকে অদ্ভুত চাপা আলো ফুটে বেরুচ্ছে।

ওখানে একটা ফ্যাক্টরি আছে। ঐ আলোটা ফ্যাক্টরির চুল্লির ঢাকা সরিয়ে দিলে দেখা যায়। তবু এই পরিচিত নিস্তব্ধ রাত অচেনা মনে হচ্ছিল আমার। এ ঘরে শুধু আমরা দু'জন। পাশের ঘরে কেউ নেই। হাওয়া ছুটেছে। জমাট অন্ধকারের ঝোপ গাছপালা দুলছিল। বন্ধ জানলার এপিঠে হাওয়ার শনশনানি ক্ষীণ টানা কান্নার মতো।

যদি ঝড ওঠে? জানলা ভেঙে খেপা ঝড় এই ঘবেব মধ্যে ঢুকে পড়ে? দত্যিদানোরা তো এমন রাতেই বেরিয়ে পডে বাইরে, ঘুবে ঘুরে বেড়ায় ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে অন্ধকারে গা মিলিয়ে। ডলিমাসি নেই, দিদিমা নেই যে আমরা একসঙ্গে হলেই ভয়গুলো সব গল্প হয়ে যাবে। গা ছমছমানি এখন কি ভীষণ সত্যি, শবীর ঝিমঝিম করছে। কাকে ডাকব? সৌরেনবাবুকে? না, তাঁকে ডাকব না। বিকেলবেলা আমরা একসঙ্গে বেড়িয়েছি, কিন্তু একটা কথাও আমি বলিনি। কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে উনি হেসে বলেছেন—আমার ওপর রাগ কবেছ খোকন? কি করেছি আমি? তাও বলবে না? আচ্ছা, কাল বলো।

বলতে বয়ে গেছে আমার। লোকটি উনি সোজা নন।

হাওয়ার শব্দ, অন্ধকাব, আকাশের চাপা লাল আলো আমাব সয়ে গেছে, আর ভয় করছে না ওদের। ভয় শুধু সৌরেনবাবুকে। কিসের ভয়? জানি না, জানি না .....। তবু ওঁকে আমার ভয় করছে। শরীরটা কাঁপছে। চোখ দুটো জ্বলে যাচ্ছে। মাথার মধ্যেটা ফাঁকা—ফাঁপা ফুটবলের মতো। বুকটা রাগে গরগর করছে। হিংসেয় আমি জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছি। সৌরেনবাবুকে মনে হচ্ছে একটা ডাকাত, গুণ্ডা। কিন্তু কেন? কেন এসব মনে হচ্ছে আমার? জানি না, জানি না কি জন্যে। তবু এক্ষুনি আমি তাঁকে ডেকে তুলে জানিয়ে দেব আমি তাঁকে ভালোবাসি না, বিশ্বাস করি না। কি জন্যে উনি যখন জানতে চাইবেন? কি বলব? কিছুই বলব না।

বলুতে বয়ে গেছে আমার। রাগটা যেন জ্বরের মতো—আমি তার ঘোরে পা টিপে টিপে দরজার কাছে গেলাম। শব্দ না করে খিল খুলে দরজা ভেজিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। আর তখনই কন-কনে ঠাণ্ডা হাওয়া আমায় ঝাপটা মারল, মনে হল মুখের চামড়া কেটে রক্ত পড়বে বুঝি। দু'হাতে মুখ ঢাকলাম। আরেকটা ঝাপটা। এবারে শীতটা যেন আমার ভেতরে ঢুকে বরফের মতো জমে গেল. বুকের ভেতরে বরফ-পাহাড়ের শীত আর চাপ, খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়েও আমি নিশ্বাস নেবার জন্য হাঁসফাঁস করতে লাগলাম। টলতে টলতে ফিরে এলাম ঘরে। দরজা বন্ধ করে বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম কোনোমতে। কম্বল লেপ সব টেনে নিলাম, মায়ের বুকের ওম পেতে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলাম তাঁকে। নিশ্বাসে হাওয়ার শনশনানির শব্দ। পরক্ষণেই লেপ সরিয়ে দিলাম, নিশ্বাস আটকে আসছে যেন। মাকে ডাকব? বুকটাকে যেন কেউ দড়ি দিয়ে কষে বাঁধছে। আমি চিৎকার করে মাকে ডাকলাম। একটা ঘরঘর শব্দ বেরুল শুধু। মা'র ঘুম ভাঙল কিনা জানি না, তার আগেই সব-ছেয়ে-যাওয়া অন্ধকারে আমি তলিয়ে গেলাম, হারিয়ে গেলাম।

॥ তেরো ॥

দিনের পর রাত্রি, আবার দিন—এই প্রবাহিত সময়ের চেতনা আমার হারিয়ে গিয়েছিল। সময় স্থির হয়েছিল। শুধু একটা ফ্রেমে কয়েকটা ছবি মাঝে মাঝে আমার ঘোলাটে দৃষ্টির সামনে ভেসে ভেসে উঠত। কখনো মায়ের ভীত বিবর্ণ মুখ, কখনো চিন্তাকুল সৌরেনবাবুর, ফ্রেমের প্রান্তে পথগুর মুখখানাও কখনো কখনো উঁকি দিত। মা সৌরেনবাবু কথা বলতেন, বহুদূর থেকে ভেসে-আসা মৃদু গানের মতো শব্দগুলিকে আমি নিঃশেষে গ্রহণ করতে চাইতাম।

কিন্তু হায়, জলবিম্বের মতো মুখগুলি ভেঙে খানখান হয়ে যেত নিমেষে, নিশ্বাসের প্রবল আকুতি আমাকে গাঢ় তরল অন্ধকারে ঠেসে ধরত আবার। প্রতিবার অজানা পৃথিবীতে যেন আমি চোখ মেলতাম, এবং স্মৃতি ও চিন্তার সীমার মধ্যে কোনো কিছুকে ধরতে পারার আগেই আবার বিস্মৃতি ও জড়ত্বে হারিয়ে ফেলতাম নিজেকে।

একদিন মায়ের মুখ আর জলবিম্বের ন্যায় দেখাল না। আমি হাত তুলে তাঁর মুখ স্পর্শ করলাম। তিনি হাতখানা গালে চেপে রাখলেন। এটুকুতেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। অসহ শ্রান্তি, কিন্তু আবার সব কথা মনে করতে পারছি, বুঝতে পারছি এখন সকাল, যে পাখিটা ডাকল পথগুর ময়না সেটা। সময় আর দাঁড়িয়ে নেই, চলছে। কথা কইতে ইচ্ছে করল, চেষ্টা করলাম। মা ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন—কথা বলো না, ঘুমোও। আমি তাঁর কথা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

মা খুব রোগা হয়ে গেছেন। কি জানি কতদিন আমি এভাবে পড়ে আছি। ভাবতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ ছেয়ে ঘুম নেমে এল।

ঘুম ভাঙতে দু'টি মৃদুকণ্ঠের কথা কানে এল।

—বিপদ কেটে গেছে উষা।

—এখানে আর নয়।

—হ্যাঁ, ফিরে যাওয়াই ভালো। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা তোমাকে আমার বলার আছে।

—বলুন।

—এখনই?

—ক্ষতি কি।

—খোকনের সব ভার আমাকে নিতে দাও।

—ওর জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন আপনি, ও আপনারই… ..

—কিন্তু ·····কোন্ অধিকারে ?

মা চুপ।

সৌরেনবাবুই আবার বললেন—উষা, সে অধিকার একমাত্র তুমিই আমাকে দিতে পার, আমাকেও স্বীকার করে নিয়ে।

—খোকনের মুখ চেয়ে আমি কি করে তা পারি বলুন ····

সৌরেনবাবুর মুখে আর কথা নেই। বড়দের এইসব জটিল বাক্যালাপের অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হলেও সৌরেনবাবু যে হেরে গেলেন আমার কাছে তা আমি বুঝলাম। ওঁর 'পরে আর আমার রাগ রইল না, বরং একটু পরে যখন আমার বুক যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে উনি বললেন 'আবাব আমাকে ডাক্তারি করিয়ে ছাড়লে তো' তখন নিজের এই আশ্চর্য কৃতিত্ব যেন ওঁর প্রতি আগের ভালোবাসায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল আমাকে!

*　　　*　　　*　　　*

আজ এই হারজিতের প্রশ্নটা পরিষ্কার। এখন ভাবি, দুঃখ পাই। ওঁরা দু'জন যদি সেদিন পারতেন লৌকিক ভয় আর হয়তো বা সংস্কারের বাধাটাকে ভেঙে ফেলে পরস্পরকে গ্রহণ করতে? কি ক্ষতি হত? একটি শিশুর ভালোবাসার সহজাত অধিকার-বোধের প্রশ্নটা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সেটাও কি দু'জনের ভালো-বাসা, যা দিয়ে আমার বুক ভরে রেখেছেন তাঁরা, তা-ই দিয়েই জয় করা সম্ভব হত না? ওঁরা যদি একটু সাহসী হতে পারতেন সেদিন, তাহলে ঐ দু'টি স্নেহময় প্রবীণ মুখ আজ পূর্ণতার আলোয় আরো স্নিগ্ধ হয়ে উঠতে পারত, আর আমিও মুক্ত হতে পারতাম একটা অজ্ঞান অপরাধের ক্ষীণ গ্লানি থেকে।